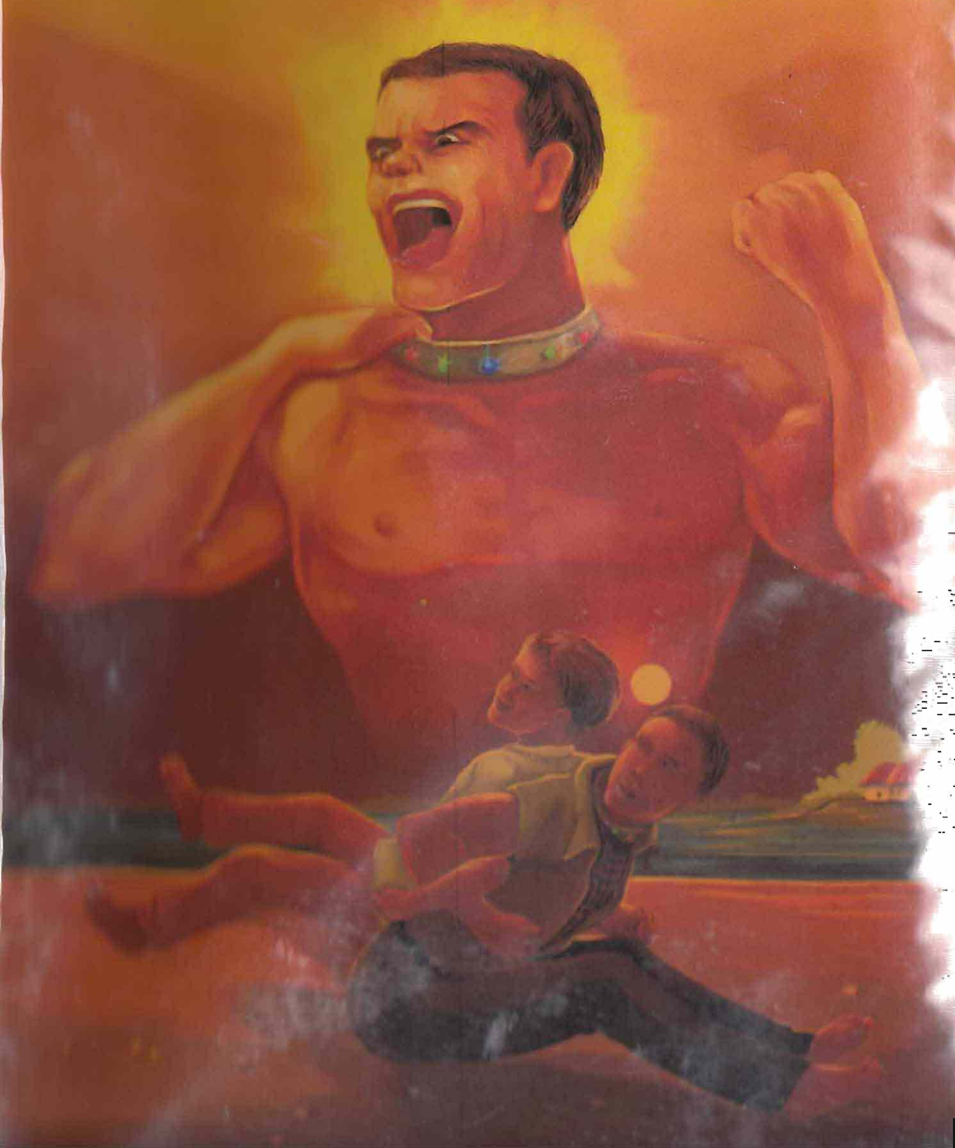
বজ্রগোলাপ

অনীশ দেব



বজ্র গোলাপ

ছোটদের কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য উপন্যাস

অনীশ দেব

।। এক ।।

ঘিয়া নদীর পাড়ে রাহুলের সঙ্গে কোকোর প্রথম দেখা হয়েছিল। ভিজে জামা-কাপড়ে একটা বটগাছের নীচে কোকো অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

সেদিন আকাশে অনেক মেঘ ছিল। তাই বৃষ্টির আশায়-আশায় ছিল সবাই। কিন্তু সন্ধে পর্যন্ত বৃষ্টির দেখা মেলেনি। অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা থোকা-থোকা ঘন মেঘ মাথার ওপরে ঝুলছিল। আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে বিদ্যুতের আলো ঝলসে উঠছিল। আলোর পরই গুড়-গুড়ুম। মেঘের ডম্বরু বাজছিল।

মোহনকুমার স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শিল্ড-এর ফাইনাল ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল রাহুল। সঙ্গে তিন বন্ধু—গোপাল, নিধু, আর দীপায়ন। খেলাটা ছিল ওদের পাশের গ্রামে—যে-গ্রামটার নাম ভারী অদ্ভুত তিনমাইল। এই নামটার কারণ বাপির কাছে জানতে চেয়েছিল রাহুল। সে বেশ কয়েকবছর আগে—যখন ও ক্লাস ফাইভে পড়ত। তখন বাপি বলেছিল, 'সাত বছর আগেও গ্রামটার কোনও নাম ছিল না। সবাই বলত মণিমেলার পাশের গ্রাম। তারপর ঘিয়া নদীতে নতুন ব্রিজ তৈরি হল। সেটা থেকে ওই গ্রামটার দূরত্ব মোটামুটি তিনমাইল। লোকের মুখে-মুখে ওই তিনমাইল দূরত্বের ব্যাপারটা ঘুরতে-ঘুরতে তা থেকে শেষ পর্যন্ত ওটা গ্রামের নাম হয়ে গেছে।'

তিনমাইলের ফুটবল খেলায় রাহুলরা কোনও দলের সাপোর্টার ছিল না। স্রেফ ফুটবল খেলার নেশাতেই ওরা চারজন ফাইনাল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল। ম্যাচ শেষ করে ফেরার সময় আকাশের অবস্থা ঠিক যেন বৃষ্টি হব-হব। তাই কখনও হেঁটে কখনও ছুটে ওরা মণিমেলার দিকে ফিরছিল।

একটু পরেই ওরা ঘিয়া নদীর পাড়ে পৌঁছে গেল। এবার নদী

পেরোলেই মণিমেলা। উঁচু পাড় থেকে মাটির ঢাল জলের দিকে নেমে গেছে। নদীতে জল এখন বেশি নেই। গত দু-সপ্তাহে দু-তিনদিন বৃষ্টি হলেও বর্ষা সেরকমভাবে এখনও শুরু হয়নি। তাই ঘিয়া এখন শান্ত, নিরীহ। বর্ষার দাপটে এই শান্তশিষ্ট নদীটার রূপ বদলে যায়। তখন ঘিয়ার এত স্রোত থাকে যে, সাঁতরে এপার-ওপার করতেও ভয় হয়।

রাহুলরা নদীর পাড়ে যেখানটায় এসে দাঁড়াল সেখানে কোনও ব্রিজ নেই। তবে খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা আছে। ছোট ডিঙিনৌকো—বড়জোর দশ-বারোজন দাঁড়াতে পারে। খেয়া পার হয়ে গেলে রাহুলদের বাড়িটা কাছাকাছি হয়। ব্রিজ দিয়ে ঘিয়া পেরোতে হলে অনেকটা ঘুরপথ হয়ে যায়।

রাহুল-গোপালরা সবাই সাঁতার জানে। তাই বেশ সহজভাবে ওরা নৌকোর ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল আর ফাইনাল খেলা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল।

কথা বলতে-বলতে রাহুল বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। যদি বৃষ্টি নামে তা হলে আর রক্ষে নেই। না, বৃষ্টিতে ভেজার ভয় ও করছে না। আসলে স্কুল-লাইব্রেরির দুটো গল্পের বই ও টেবিলের খোলা জানলার কাছে রেখে এসেছে। ওগুলো যদি ভিজে যায়!

ঘিয়া পার হয়ে ওরা চারজন নদীর পাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল। ঠিক তখনই আচমকা ঝড় উঠল। ঠান্ডা বাতাস ওদের ঘিরে পাক খেতে লাগল আর কালো আকাশ থেকে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি টপাটপ্ করে পড়তে শুরু করল।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটা বড়-বড় গাছ ঝোড়ো বাতাসে হেলে পড়েছিল। ওদের ডালপালা-পাতা পতাকার মতো উড়ছিল।

চোখে হাত চাপা দিয়ে রাহুল ধুলো আটকাচ্ছিল। সেই অবস্থায় পা হড়কে গিয়ে ও বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়ল। ততক্ষণে নিধু, গোপাল আর দীপায়ন নদীর ঢাল পেরিয়ে ওপরের কাঁচা রাস্তায় উঠে পড়েছে।

নিধু একবার চেঁচিয়ে রাহুলকে ডাকল, 'জলদি আয়। এখুনি জোরে বৃষ্টি আসবে...।'

সেই চেষ্টাই করছিল রাহুল। এছাড়া খোলা জানলার কাছাকাছি রাখা



ঝুরি-নামা একটা বটগাছের নীচে পড়ে আছে একটা মানুষ

বইগুলো ভিজে যাবে, এই ব্যাপারটাও মাথায় ছিল। তাই আরও জোরে পা চালাল। আর ঠিক সেই সময়েই সীসের মতো আকাশে নীলচে সাদা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। পলকের জন্য চারপাশটা আলোয় আলো হয়ে গেল। আর তখনই লোকটাকে দেখতে পেল ও। সঙ্গে-সঙ্গে বিকট শব্দে বাজ পড়ল।

নদীর পাড়ে দাঁড়ানো ঝুরি-নামা একটা বটগাছের নীচে পড়ে আছে একটা মানুষ। রাহুলের কাছ থেকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ফুট দূরে। এই মেঘলা কমজোরি আলোয় লোকটাকে হয়তো চোখেই পড়ত না যদি না ওর শরীর থেকে চকচকে কিছু একটা বিদ্যুতের আলোয় ঝিলিক মেরে উঠত।

রাহুলের পথ বেঁকে গেল। ও পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল লোকটার কাছে। ওর ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

বৃষ্টি এখনও না পড়ার মতন, অথচ মানুষটার জামা-প্যান্ট সব জলে ভিজে সপসপে। পায়ে জুতো নেই। গায়ের রং ফরসা। তাই শরীরের কাটা দাগগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ছে। ছুরির ডগা দিয়ে কেউ যেন ওর হাত-পায়ে দাগ কেটেছে। সেই চেরা জায়গাগুলো থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

পাশ ফিরে মাটির দিকে মুখ ঘুরিয়ে অসাড়ভাবে পড়ে আছে লোকটা। বেঁচে আছে না মরে গেছে বোঝার উপায় নেই।

যে-জিনিসটা বিদ্যুতের আলোয় ঝিলিক মেরে উঠেছিল এবার সেটার দিকে তাকাল রাহুল। গলায় আটকানো একটা মেটাল ব্যান্ড। অনেকটা কুকুরের বকলসের মতো। এক কি দেড় সেন্টিমিটার চওড়া।

রাহুলের একবার মনে হল, লোকটা কি নেশা করে পড়ে আছে? আবার মনে হল, লোকটা ঘিয়া নদীর জলে ভেসে আসেনি তো? ও ঝুঁকে পড়ে লোকটাকে ডাকল 'এই যে, শুনছেন! এই যে—।'

কোনও সাড়া নেই।

লোকটা কি মরে গেছে? নাকি অজ্ঞান হয়ে গেছে?

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে মরিয়া হয়ে লোকটাকে ঠেলা মারল রাহুল 'এই যে, শুনছেন!'

না, কোনও সাড়া নেই। শুধু বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দ আর গাছের পাতার ছটফটানির আওয়াজ।

এদিকে রাহুলকে পিছনে দেখতে না পেয়ে নিধু-গোপালরা ফিরে আসছিল। রাহুলের নাম ধরে বারবার ডাকছিল।

দু-হাতে লোকটার ডানকাঁধ ধরে টান মারল রাহুল। লোকটার শরীরটা আধপাক ঘুরে চিত হয়ে গেল।

লোকটাকে ভালো করে দেখল রাহুল।

বয়েস কত হবে, বড়জোর সাতাশ-আটাশ। মাথায় কদমছাঁট চুল। ছোট-ছোট চোখ। নাকটা সামান্য থ্যাবড়া। ঠোঁটজোড়া একটু ফাঁক হয়ে থাকায় দাঁত দেখা যাচ্ছিল।

রাহুল লক্ষ করল, লোকটার দু-গালে নতুন দশ পয়সার মাপের তিনটে কালচে গোল দাগ। কেউ যেন কড়ে আঙুল দিয়ে কাজলের টিপ পরিয়ে দিয়েছে।

লোকটার মুখে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল। একইসঙ্গে রাহুল ওকে ধাক্কা দিচ্ছিল, ডাকাডাকি করছিল।

এমন সময় গোপালরা রাহুলের কাছে পৌঁছে গেল। লোকটাকে দেখে ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে দিল, তর্ক জুড়ে দিল। আর লোকটার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। থুতনি ধরে এপাশ-ওপাশ নাড়তে লাগল। বুকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

ওরা এটুকু বুঝল, জামা-প্যান্ট ভিজে থাকলেও লোকটার শরীরে তাপ আছে। বুকে কান পেতে ধরলে ধুকপুকুনি দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছে। লোকটা যে বেঁচে আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর শরীরের কাটা দাগগুলো এল কেমন করে? আর ওর গলার মেটাল ব্যান্ডটাই বা কী?

এর মধ্যেই ঝড় কিছুটা কমে গেছে। বৃষ্টি একটু জোরালো হয়েছে। গাছের পাতার খসখসানি শব্দও খানিকটা স্তিমিত। ওরা তখনও লোকটাকে জাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

হয়তো বৃষ্টির জল মুখে পড়ার জন্যই হঠাৎ লোকটা চোখ খুলে তাকাল। চারটে মুখ ওর ওপরে ঝুঁকে রয়েছে দেখে ভয়ের একটা চাপা চিৎকার করে উঠল।

নিধু ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ভয় পেয়ো না। কোনও ভয় নেই।'

দীপায়ন জিগ্যেস করল, 'তুমি কে? নদীর পাড়ে এখানে কোত্থেকে এলে?'

লোকটা ভয়ের চোখে ওদের মুখগুলোর ওপরে একবার নজর বুলিয়ে নিল। তারপর ডানহাতটা শূন্যে তুলে নদীর দিকে দেখাল। যেদিক থেকে ঘিয়া নদী বয়ে আসছে সেদিকে। রাহুল লক্ষ করল, লোকটার হাত কাঁপছে।

রাহুল তাকাল নদীর উজানের দিকে। তা হলে কি লোকটা নদীর জলে ভেসে এসেছে?

রাহুল জিগ্যেস করল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

লোকটা সরল চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল রাহুলের দিকে। তারপর দু-হাতের আঙুল এমনভাবে ঘোরাল যার মানে কোথায় যাবে ও জানে না।

'তোমার বাড়ি কোথায়?' গোপাল জানতে চাইল।

লোকটা কোনও উত্তর দিল না। শূন্য চোখে গোপালের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে?' রাহুল জিগ্যেস করল।

ভাঙা কর্কশ গলায় লোকটা টেনে-টেনে জবাব দিল, 'কেউ....নেই।' মনে হচ্ছিল ওর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

রাহুল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই লোকটা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল।

'কেউ....নেই। কেউ....নেই।' বলতে লাগল বারবার এবং হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। রাহুলের পায়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাগলের মতো পায়ে মাথা ঘষতে লাগল আর কাঁদতে লাগল।

রাহুল কোনওরকমে এক পা পিছিয়ে এল। সবাই মিলে ধরাধরি করে ওকে দাঁড় করাল। লোকটা তখনও মুখ বিকৃত করে কাঁদছে। গুঙিয়ে-গুঙিয়ে কী বলছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

রাহুল অবাক হয়ে লোকটার সরল কান্না-ভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দীপায়ন, নিধু আর গোপাল তখন নিজেদের মধ্যে কথাবলাবলি করতে লাগল।

কী করা যায় লোকটাকে নিয়ে?

কেউ বলল, 'ছাড় তো। ও এখানেই পড়ে থাক। পরে যেখানে যায় যাবে।'

একজন বলল, 'চল, আমরা গিয়ে থানায় খবর দিই....।'

আর-একজন বলল, 'দাদাদের ক্লাবে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে হত।'

'না, তার চেয়ে বরং পার্টি অফিসে নিয়ে চল। ওরা থানা-পুলিশ যা করার করবে।'

বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এরকম এলোমেলো কথাবার্তা শোনার পর রাহুল ফস করে বলে উঠল, 'আমি ওকে বাড়িতে নিয়ে যাব।'

সঙ্গে-সঙ্গে নিধু, গোপাল আর দীপায়ন চুপ করে গেল। ওরা এমন চোখে রাহুলের দিকে তাকাল যেন রাহুলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

রাহুল ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া আহত লোকটার দিকে তাকাল। হাত বাড়াল ওর দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা এমনভাবে ওর হাতটা আঁকড়ে ধরল যেন এটা ছেড়ে দিলে ও আর বাঁচবে না। ভয়ের চোখে রাহুলের দিকে তাকাল।

রাহুল চাপা গলায় ওকে বলল, 'কোনও ভয় নেই।'

নিধু, গোপাল আর দীপায়নের সঙ্গে তর্ক করতে-করতে রাহুল এগোল। ওর হাত আঁকড়ে ধরে মাথা নীচু করে লোকটাও এগোল।

বৃষ্টি আরও বেড়ে গেছে। ওদের জামাকাপড় ভিজে যাচ্ছে। গাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ হচ্ছে। ভেজা মাটি থেকে বৃষ্টির অদ্ভুত গন্ধ উঠছে।

দীপায়নদের নানান উপদেশ আর খোঁচার জবাবে রাহুল বলল, 'আজ রাতটা তো ও আমাদের বাড়িতে থাক। কাল সকালে বাপি যা করার করবে....।'

কাঁচা রাস্তায় বৃষ্টির জল পড়ে কাদা তৈরি হচ্ছিল। তার ওপরে ওরা ছপছপ শব্দে পা ফেলে এগোচ্ছিল। খালি পায়ে চলার জন্য লোকটার বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। কারণ, পথের নানা জায়গায় ইট-পাথরের টুকরো, গাছের ভাঙা ডাল মাড়িয়ে চলতে হচ্ছিল। কিন্তু লোকটা মুখে টুঁ শব্দটিও করছিল না। সরল মুখে মাথা নীচু করে হাঁটছিল।

একটা পুকুরের কাছে এসে রাহুলের পথ আলাদা হয়ে গেল। ও

লোকটাকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। গোপালদের বলল যে, কাল কী হয় না হয় সেটা কাল ওদের জানাবে।

রাহুল বৃষ্টিতে বেশ ভিজে গেছে। ও বাঁ-হাতের পাতা কপালের সামনে গাড়িবারান্দার মতো রেখে বৃষ্টির ছাট আটকাতে চেষ্টা করছিল। লক্ষ করল, এতটা পথ আসার সময় লোকটা একবারও বৃষ্টি আড়াল করার চেষ্টা করেনি। বরং এমনভাবে ও পথ চলছে যেন বৃষ্টি পড়ছেই না।

রাহুল হঠাৎই ওকে জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী?'

লোকটা ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ভাবলেশহীন নিষ্পাপ মুখ। কোনও উত্তর দিল না।

রাহুল আবার একই কথা জিগ্যেস করল।

কোনও উত্তর নেই।

তবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রাহুলের মনে হল, ও যেন তীব্রভাবে কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করছে। হয়তো ওর নামটাই মনে করার চেষ্টা করছে।

রাহুল হাল ছাড়ল না। তৃতীয়বার ওর নাম জানতে চাইল।

এবার লোকটা ভাঙা কর্কশ গলায় টেনে-টেনে জবাব দিল, 'কোকো। আমার নাম কোকো। কো-কো....।'

কোকো! কী অদ্ভুত নাম! আপন-মনেই ভাবল রাহুল।

কালচে আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তারপরই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল।

বাড়ির সামনে এসে গিয়েছিল রাহুল। বাউন্ডারির গ্রিলের গেটের হুড়কো খুলে ভেতরে ঢুকল। ওর হাত আঁকড়ে থাকা কোকোও ঢুকে পড়ল ওর সঙ্গে।

বাউন্ডারির গেট থেকে ইট-পাতা পথ চলে গেছে একতলা বাড়িটা পর্যন্ত। বাড়ির বাঁ-দিকটায় বেশ কয়েকটা গাছপালা। অযত্নে বেড়ে ওঠা বাগান। তার একটা ছোট অংশে অনেক ফুলগাছ। আর তার পাশে একটা টিউবওয়েল।

ইট-পাতা পথ ধরে এগোতে-এগোতেই রাহুল চেঁচিয়ে মা-কে ডাকল, 'মাম, শিগগির দরজা খোল। একেবারে ভিজে গেছি।'

বাড়ির দরজায় পৌঁছে মা-কে আরও একবার ডাকল রাহুল। একইসঙ্গে কলিংবেল টিপল।

দরজা খুলে গেল। মা দরজায় দাঁড়িয়ে। ওকে দেখেই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ঠিক জানতাম আজ তুই বৃষ্টিতে ভিজবি। তোর বাপিকে বলছিলাম....' মায়ের কথা মাঝপথেই থেমে গেল, কারণ কোকোকে তিনি এইমাত্র খেয়াল করেছেন।

রাহুলের মা গলা নামিয়ে ছেলেকে জিগ্যেস করলেন, 'এ কাকে সঙ্গে এনেছিস?'

রাহুল বলল, 'মাম, ওর নাম কোকো। ওর খুব বিপদ। ঝিয়ার পাড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল....।'

।। দুই ।।

পরদিনটা ছিল রবিবার। রবিবারটা সবসময়েই রাহুলের কাছে কেমন যেন অন্যরকম দিন বলে মনে হয়। সেদিন সকালে যে-সূর্যটা ওঠে সেটা অন্যরকম। সকালে যে-পাখিগুলো ডাকে তাদের ডাকগুলো আলাদা। ওদের বাগানে যে-ফুলগুলো ফোটে রবিবার তাদের একটু বেশি হাসিখুশি বলে মনে হয়।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে রাহুল সেই 'অন্যরকম' সকালটাকে অনুভব করল। তারপরই ওর মনে পড়ে গেল কোকোর কথা।

জানলা দিয়ে আকাশ দেখল রাহুল। ছেঁড়া-ছেঁড়া ছাই-রঙা মেঘ। তার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ভোরের খবর পাঠাচ্ছে পৃথিবীতে। গাছের চকচকে সবুজ পাতায় সেই আলো ঠিকরে যাচ্ছে। কাল সন্ধের বৃষ্টিতে পাতাগুলো স্নান-টান সেরে আজ একেবারে ঝকঝকে হয়ে সেজে উঠেছে। তারই ফাঁকে-ফাঁকে ভেসে বেড়াচ্ছে পাখির ডাক।

আজ সকালটাকে দেখে মনেই হয় না কাল সন্ধেয় ওরকম ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল।

বিছানা ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল রাহুল। আর তখনই কোকোকে দেখতে পেল।

বারান্দার ডানদিকে ফুলের বাগান। সেখানে অনেকগুলো সূর্যমুখী ফুলের গাছ। এখন দু-চারটে ফুল ফুটেছে—বাকি সব কুঁড়ি। তার পাশেই কয়েকটা বেলফুল আর গোলাপের গাছ। তাতে সাদা আর গোলাপি ফুল। নাকে না হলেও মনে-মনে ফুলের গন্ধ পেল রাহুল। নাক টেনে চোখ বুজল ও।

চোখ খুলতেই কোকোকে দেখতে পেল। একটা জামগাছের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। তারপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে নেচে-নেচে ছুটে বেড়াতে লাগল আর একই সঙ্গে হাততালি দিতে লাগল।

ভালো করে খেয়াল করতেই রাহুল একটা হলদে-কালো প্রজাপতিকে

দেখতে পেল। প্রজাপতিটা ফুলের বাগানে এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে আর কোকো তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওটার পিছন-পিছন ছুটছে।

না, প্রজাপতিটা ধরার জন্য ও মোটেই ছুটছে না। বরং এক বিচিত্র উল্লাসে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ওটাকে অনুসরণ করছে।

সাতাশ-আটাশ বছরের ছেলেটাকে একটা বাচ্চা ছেলে বলে মনে হল রাহুলের। সরল ভোলাভালা চোখ, শরীরের কাটা-ছেঁড়া সম্পর্কে উদাসীন, কোথা থেকে ও এসেছে, কোথায় যাবে, সে-সম্পর্কে ওর চিত্ত ভাবনাহীন।

বারান্দার গ্রিলের দরজা ঠেলে সরিয়ে দু-ধাপ সিঁড়ি নামল রাহুল। পায়ে-পায়ে বাগানের দিকে এগোল।

বাগানের মাটি ভেজা। কোথাও-কোথাও কাদা প্যাচপেচে হয়ে আছে।

ফুলগাছগুলোর দিকে তাকাল রাহুল। হলদে-কালো প্রজাপতিটা ছাড়াও কয়েকটা ফড়িং ওড়াউড়ি করছে সেখানে। কিন্তু কোকোর যত আগ্রহ প্রজাপতিটাকে নিয়ে।

রাহুলকে দেখতে পেয়েই খুশিতে উজ্জ্বল হল কোকোর মুখ। ও চেঁচিয়ে বলল, 'এই...দ্যাখো। প্রজা...পতি। হলুদ...আর...কালো। প্রজা...পতি।'

একইরকম কর্কশ স্বর আর টেনে-টেনে কথা বলা। যেন ঠান্ডা লেগে বরাবরের জন্য গলা ভেঙে গেছে।

কোকোর উৎসাহ, খুশি, আর কথা বলার ঢং রাহুলের সমবয়েসি কোনও বন্ধুর মতন। কাল সন্ধে থেকেই ব্যাপারটা রাহুল লক্ষ করেছে। তাতে ও বেশ মজাও পেয়েছে।

প্রথমটায় কোকোকে দেখে রাহুলের মাম আর বাপি খুব অবাক হয়েছিলেন। কোকোকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ভেতরের ঘরে রাহুলকে ডেকে নিয়ে মাম ওকে অনেক প্রশ্নও করেছেন।

সেসব কথা শুনতে পেয়ে বাড়ির ভেতর থেকে বাপিও সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। দুজনের প্রশ্নের ঠেলায় রাহুলের তো অবস্থা কাহিল!

বাপি বললেন, 'বোঝোই তো...দিন-কাল ভীষণ খারাপ। ওকে তুমি চেনো না, জানো না....।'

সেইসঙ্গে মাম যোগ করলেন 'তা ছাড়া ওর গায়ে অত জায়গায়

কাটা...রক্ত পড়ছে। কে জানে খুন-টুন করে পালিয়ে এসেছে কি না। তারপর থানা-পুলিশ হয়ে একেবারে কেলেংকারি হবে।'

রাহুল অবাক হয়ে বলল, 'তা হলে কোকো এখন কোথায় যাবে, মাম? ওর তো কেউ নেই! ও মনে হয় ঘিয়ার জলে ভেসে এসেছে। বললাম তো, ভিজে জামাকাপড়ে একটা গাছের তলায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল....।'

বাপি কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, 'কাল থেকে সবাই তো ওর কথা জিগ্যেস করবে। তখন কী জবাব দেব?'

'কেন বাপি, যা সত্যি তাই বলবে!' রাহুল সঙ্গে-সঙ্গে সমাধান জুগিয়ে দিল, 'কোকো আমাদের কাছে থাকলে তাতে কার কী!'

'এভাবে বলতে নেই, রাহুল।' মাম ওকে শাসনের গলায় বললেন, 'তা ছাড়া তুমি তো জানো, এখন চার-পাশে যা চলছে তাতে কোনও অচেনা লোককে এভাবে শেলটার দেওয়া ঠিক নয়। কে বলতে পারে যে, লোকটা চোর কিংবা ডাকাত নয়! কাল বরং থানায়...।'

'আমি...চোর...না। আমি...ভালো।'

এ-কথা শুনে তিনজনেই চমকে ঘুরে তাকিয়েছে।

কোকো বাইরের ঘর ছেড়ে কখন যেন ঢুকে পড়েছে ভেতরের ঘরে। তারপর ওর ভাঙা গলায় নিজের ক্যারেকটার সার্টিফিকেট নিজেই প্রচার করে চলেছে।

'বিশ্বাস...করো। আমি...চোর...না। আমি...খুব...ভালো।'

ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া সরল ছেলেটার মুখে এ-কথা শুনে বাপি হেসে ফেললেন।

রাহুল ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরে বলল, 'কোকো, তুমি খুব ভালো। গুড বয়।'

কোকো হাসল 'আমি...গুড...বয়। আমি...গুড...বয়।'

মাম কোকোর দিকে চেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কী করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

রাহুল মামের কাছে এল আবার। মামের হাত ধরে আবদারের গলায় বলল, 'মাম, ওকে শিগগির শুকনো জামাকাপড় দাও। ওর যে ঠান্ডা লেগে যাবে!'

মাম চমকে উঠে ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠলেন।

বাপিও বললেন, 'রাহুল ঠিক বলেছে। ওকে আগে শুকনো জামা-প্যান্ট দাও। রাহুলেরটা ওর গায়ে হবে না—আমার একটা পাজামা আর শার্ট দাও। তারপর ওর কাটা জায়গাগুলোয় লাল ওষুধ আর ব্যান্ড-এইড লাগিয়ে দিচ্ছি।'

রাহুল কৃতজ্ঞতার চোখে বাপির দিকে তাকাল।

বাপি বললেন, 'শোন, ওকে আগে ড্রেস-ট্রেস দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে কিছু খাওয়াই। বোধহয় বেচারা অনেকক্ষণ না খেয়ে আছে। তারপর....।'

রাহুল অবাক চোখে বাপির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'তারপর কী?'

'তারপর ওকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। ওর হিস্ট্রিটা জানার চেষ্টা করতে হবে, বুঝলি?'

রাহুল কী বুঝল কে জানে! কিন্তু ও আলতো করে ঘাড় নাড়ল।

কোকো রাহুলের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি...গুড...গুড...বয়...। ভেরি...গুড...বয়।'

রাহুল হেসে বলল, 'ভেরি গুড বয়।'

সেই 'ভেরি গুড বয়' এখন বাপির একটা নীল হাফশার্ট আর পাজামা পরে বাগানে প্রজাপতির পিছনে ছুটছে।

বাপি কাল রাতেই কোকোর 'হিস্ট্রি' জানার চেষ্টা করেছেন। যেটা নিয়ে বাপির বিশেষ কৌতূহল ছিল সেটা নিয়েও ওকে প্রশ্ন করেছেন। সেই জিনিসটা নিয়ে মাম আর রাহুলেরও ভীষণ কৌতূহল ছিল। তাই রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে ওরা তিনজনে কোকোকে নিয়ে বসেছে।

কোকো বসবার ঘরের একটা চেয়ারে হাঁটু মুড়ে বাবু হয়ে বসেছিল। ও আরামের শব্দ করে কয়েকবার ঢেঁকুর তুলল। রাহুল, বাপি আর মামের মুখের দিকে একবার করে তাকাল।

রাহুলরা তিনজন কোকোকে প্রায় ঘিরে বসেছিল। ওকে কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর বাপি জিগ্যেস করলেন, 'কোকো, তোমার গলায় ওটা কীসের ব্যান্ড?'

কোকো কোনও জবাব দিল না। ওর ডানহাতটা গলার কাছে চলে গেল। স্টিলের ব্যান্ডটার ওপরে ও আঙুল বোলাতে লাগল।

বাপি আবার জিগ্যেস করলেন, 'ওটা কীসের বেল্ট, কোকো? বলো—কোনও ভয় নেই। তুমি তো গুড বয়।'

অল্প হাসল কোকো। অস্পষ্টভাবে বলল, 'আমি তো...গুড...বয়।'

এবার রাহুল ওকে জিগ্যেস করল, 'তোমার গলার এই ব্যান্ডটা কীসের, কোকো?'

কোকো তেরছা চোখে সিলিং-এর দিকে তাকাল। একমনে কী যেন ভাবার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ খুশির সুরে বলে উঠল, 'মনে...পড়েছে। এটা কন্ট্রোল...ব্যান্ড। আমি...গুড...বয়।'

কন্ট্রোল ব্যান্ড! কীসের কন্ট্রোল ব্যান্ড? রাহুল অবাক চোখে কোকোর গলার ব্যান্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল।

জিনিসটা চেহারায় অনেকটা ঘড়ির ব্যান্ডের মতো। তবে মসৃণ গোল নয়। চার জায়গায় কবজার জোড় রয়েছে। আর ব্যান্ডটার ডানদিকে—মানে, কোকোর বাঁ-কানের ঠিক নীচে—একটা চ্যাপ্টা চৌকোনা মেটাল বক্স লাগানো রয়েছে। বক্সটার মাপ অনেকটা দেশলাইয়ের বাক্সের মতো। তবে মাত্র পাঁচ কি ছ' মিলিমিটার পুরু। সেই বাক্সের ওপরে চারটে খুদে এল. ই. ডি. ল্যাম্প। এখন নিভে আছে।

'এই কন্ট্রোল ব্যান্ডটা তুমি কী জন্যে গলায় পরে আছ?' রাহুল জিগ্যেস করল, 'কে তোমার গলায় এটা পরিয়ে দিয়েছে?'

আবার চিন্তায় পড়ে গেল কোকো। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বলল, 'মনে পড়েছে। এটা মাস্টারজি...পরিয়ে... দিয়েছে। মাস্টারজি...দিয়েছে।'

'কে মাস্টারজি?' মাম জিগ্যেস করলেন।

কোকো একগাল হেসে বলল, 'মাস্টারজি। মাস্টারজি।'

বাপি আর রাহুলও বারকয়েক একই প্রশ্ন করল কিন্তু কোকোর সেই একই উত্তর।

তখন বাপি জিগ্যেস করলেন, 'এটা তুমি গলায় পরেছ কেন?'

কোকো দু-পাশে মাথা নাড়ল। ও জানে না।

'এটার নাম কন্ট্রোল ব্যান্ড কে বলল?'

'মাস্টারজি—'

'মাস্টারজির নাম কী?'

'মাস্টারজি।'

'মাস্টারজি কোথায় থাকেন?'

'অনেক...দূরে। অনেক...দূরে।'

বাপি কী মনে করে কোকোর গলার ব্যান্ডটার দিকে হাত বাড়ালেন 'তোমার ব্যান্ডটা একটু দেখি তো....।'

সঙ্গে-সঙ্গে সাপের ছোবল খাওয়া মানুষের মতো পিছনে ছিটকে গেল কোকো। ভয় পাওয়া চোখে বাপির দিকে তাকিয়ে বলল, 'না...না। এটায়...কেউ...হাত দেবে না। মাস্টারজির বারণ।'

'মাস্টারজির বারণ' শব্দ দুটো বারবার আওড়াতে লাগল কোকো। ঠিক যেন পুজোর মন্ত্র পড়ছে।

বাপি, মাম, আর রাহুল চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। মাম চাপা গলায় বাপিকে বললেন, 'ছেড়ে দাও। মনে হয় ব্যান্ডটা নিয়ে ওর কোনও মেন্টাল প্রবলেম আছে। পরে কখনও সুযোগ পেলে ওটা দেখো...।'

বাপি একটা লম্বা শ্বাস ফেলে সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন।

রাহুল কোকোর হাত-পায়ে লাগানো ব্যান্ড-এইডগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'তোমার হাতে-পায়ে কেটে গেল কী করে?'

রাহুলের কথায় আবার সোজা হয়ে বসল কোকো। পায়ের ভাঁজ খুলে মেঝের দিকে পা ঝুলিয়ে দিল। তারপর অবাক হয়ে নিজের হাতে আর পায়ে লাগানো ব্যান্ড-এইডগুলোর দিকে দেখল, সেগুলোর ওপরে আঙুল বোলাল। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রাহুল আবার একই প্রশ্ন করল।

রাহুলের দিকে সরল চোখে তাকাল কোকো। ধীরে-ধীরে বলল, 'মাস্টারজি মেরেছে। খুব...মেরেছে।'

রাহুলের মনে কষ্ট হল। ও মাম আর বাপির দিকে তাকাল।

মাম বললেন, 'আহা রে, এভাবে কেউ মারে?'

বাপি বিড়বিড় করে বললেন, 'ব্যাপারটা আমার তো খুব মিস্টিরিয়াস লাগছে। যাকে ও "মাস্টারজি" বলছে সে কোথাকার মাস্টার? স্কুল-কলেজের, না অন্য কিছুর?'

রাহুল এবার কোকোর গালের চাকা-চাকা দাগগুলোর দিকে



আমার...কেউ...নেই। মা...নেই। বাবা...নেই

দেখাল। আঙুল বাড়িয়ে একটা দাগ সামান্য ছুঁতেই কোকো 'উঃ!' করে উঠল।

'কোকো, এই দাগগুলো কী করে হয়েছে? এখানে ব্যথা নাকি?'

কোকো নিষ্পাপ সরল চোখে কয়েক মুহূর্ত রাহুলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর কী বুঝল কে জানে! আলতো করে বলল, 'মাস্টারজি। সিগারেট খায়। সিগারেটের ডগায়... আগুন থাকে। সেই আগুন দিয়ে... ছ্যাঁকা দিয়েছে। ছ্যাঁকা। তিনবার। আরও দিত। আমি...আমি...।'

'"আমি" কী?' রাহুল ওকে কথা ধরিয়ে দিতে চাইল।

'আমি কেউ না। আমার...কেউ...নেই। মা...নেই। বাবা...নেই।'

কোকো হঠাৎই কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগল।

সেটা লক্ষ করে বাপি বললেন, 'রাহুল, ওকে এবার রেস্ট নিতে দাও। আমার মনে হচ্ছে, ও বেশ ট্রাব্‌ল্‌ড। মেন্টালি আপসেট হয়ে আছে। তা ছাড়া ওর বুদ্ধির ব্যাপারটাও বোধহয় স্বাভাবিক নয়।'

মাম বাপিকে বললেন, 'ও ক'টা-দিন আমাদের কাছে থাকুক। একটু সেরে-টেরে উঠুক—তারপর পুলিশে খবর দিয়ে ওর বাড়ির খোঁজখবর করা যাবে। এখন ওকে থানা-পুলিশে দিলে ওকে পাগলদের হোমে পাঠিয়ে দেবে।'

'না, না, ওখানে কিছুতেই ওকে পাঠিয়ো না, বাপি!' রাহুল প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল।

খবরের কাগজ আর টিভি দেখে রাহুল জানে ওই সব সরকারি হোমে আবাসিকদের কী দুরবস্থার মধ্যে রাখা হয়। কেউ চরম হেনস্থা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে, আর কেউ বা ওই হোম থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়।

বাপি রাহুলের পিঠে আশ্বাসের হাত রেখে বললেন, 'তুই কি খেপেছিস? ওকে ওই নরকে পাঠাব! ওর বাড়ি আর রিলেটিভদের ঠিকঠাক খবর না পাওয়া পর্যন্ত কোকোকে আমরা ছাড়ছি না।'

রাহুল বাপির হাতটা জড়িয়ে ধরল। ভাবল মনে-মনে, বাপি কী ভালো!

কোকো ধীরে-ধীরে শান্ত হয়ে আসছিল। রাহুল ওর দিকে লক্ষ

রাখছিল। দেখল, ওর শ্বাস-প্রশ্বাস আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে। মুখটা যেন চার-পাঁচ-বছরের কোনও শিশুর মুখ। সেই ফরসা টুকটুকে মুখে সিগারেটের ছ্যাঁকা! মাস্টারজির কাছে কী অন্যায় করেছিল কোকো যে ওকে এমন করে নৃশংসভাবে শাস্তি দিয়েছে? রাহুলের টিচাররা তো রাহুলকে কত ভালোবাসেন! ওঁদের সঙ্গে থাকতে রাহুলের কত ভালো লাগে!

কোকো হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি টিভি দেখব।'

এ-কথায় বাপি আর মাম হেসে উঠলেন। বাপি বললেন, 'হ্যাঁ, ওকে এবার ছেড়ে দাও। একটু টিভি-ঠিভি দেখুক—রিল্যাক্স করুক। রাহুল—' রাহুলের কাঁধে হাত রাখলেন বাপি : 'ওকে নিয়ে টিভি দ্যাখো। ওর সঙ্গে থাকো। তবে বেশি রাত কোরো না...।'

কাল রাতে কোকোর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছে রাহুল। ওর সঙ্গে টিভি দেখেছে। তারপর কয়েকটা রঙিন কমিক্স-এর বই ওকে দেখতে দিয়েছে। শেষে ক্লান্ত হয়ে কোকো যখন হাই তুলছিল তখন ওরা শুয়ে পড়েছে।

রাহুলের ঘরেই মাম কোকোর জন্য বিছানা পেতে দিয়েছিল। সেখানে গা এলিয়ে দেওয়া মাত্রই কোকো নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ কোকোর কথা ভেবে-ভেবে রাহুলের ঘুম এসেছে অনেক দেরিতে।

এখন সেই শিশু-যুবক একগাল খুশি নিয়ে হলদে-কালো প্রজাপতির পিছনে নেচে-নেচে ছুটে বেড়াচ্ছে।

রাহুলকে কাছে আসতে দেখে কোকো আবার বলে উঠল, 'রাহুল, এই দ্যাখো...প্রজাপতি। প্রজা...পতি।'

রাহুল হেসে ঘাড় নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ, প্রজাপতি। প্রজাপতি...সুন্দর।'

'প্রজাপতি...সুন্দর।' রাহুলের কথার প্রতিধ্বনি তুলল কোকো।

।। তিন ।।

বাজারের থলে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বাপি রাহুলকে ডাকলেন।

রাহুল ওর ঘরে কোকোকে নিয়ে বসেছিল। ওর বইপত্র, ক্রিকেটের ব্যাট-বল, এটা-সেটা কোকোকে দেখাচ্ছিল। সেই সময় বাপি দরজায় এসে হাজির হলেন।

'কী রে, রাহুল—আমার সঙ্গে বাজারে যাবি তো!'

প্রত্যেক রবিবারে রাহুল বাপির সঙ্গে বাজারে যায়। এমনিতে বাপির সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে বাজার করতে রাহুলের ভালো লাগে। তা ছাড়া রবিবারে বাপি একটু বেশি করে বাজার করেন—যাতে পরের তিনদিন বাজারে না গেলেও চলে। সেইজন্য রবিবারে বাপি তিনটে থলে নিয়ে বেরোন। ফেরার সময় থলেগুলো বেশ ভারীও হয়। রাহুল সঙ্গে থাকলে সবচেয়ে কম ওজনের থলেটা বয়ে বাপিকে সাহায্য করে।

রাহুল কোকোকে ছেড়ে চটপট উঠে পড়ল। হাতে তালি দিয়ে হাত ঝেড়ে নিয়ে বলল, 'চলো, বাপি—' দরজার দিকে এগোতে-এগোতে কোকোকে লক্ষ করে বলল, 'কোকো, তুমি এগুলো নিয়ে খেলা করো, আমি বাপির সঙ্গে বাজার করে এক্ষুনি ফিরে আসছি।'

কোকো কিন্তু ততক্ষণে মেঝে থেকে উঠে পড়েছে। রাহুলের দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় বলে উঠেছে, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

কোকো ওদের সঙ্গে গেলে রাস্তায় পাঁচজন পাঁচকথা জিগ্যেস করবে। সে-কথা ভেবেই রাহুল সাততাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, কোকো—এরকম জেদ করতে নেই। তুমি না গুড বয়?'

'আমি...গুড...বয়। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে...বাজারে...যাব।' গোমরা মুখ করে কোকো বলে উঠল।

বাপি এবার বললেন, 'না, কোকো। গুড বয়রা কথা শোনে। তুমি এখানে থাকো—খেলা করো—আমরা এক্ষুনি ফিরে আসব।'

কোকো পাঁচ বছরের বাচ্চার মতো অভিমানী মুখ করে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, ‘আমি...বাজারে...যাব। আমি...বাজারে...যাব...।’

রাহুলের মাথায় হঠাৎই একটা বুদ্ধি খেলে গেল। শেষ অস্ত্র হিসেবে সেটা প্রয়োগ করল ও।

‘তোমার তো চটি-জুতো কিচ্ছু নেই—আমাদের সঙ্গে তুমি যাবে কেমন করে! বাজারে ভীষণ জল-কাদা...।’

এ-কথা শোনামাত্রই কোকোর মুখে হাসি ফুটে উঠল। ও রাহুল আর রাহুলের বাপিকে অবাক করে দিয়ে ‘চটি...আছে! চটি...আছে!’ বলে গ্রিল দেওয়া বারান্দার দিকে ছুট লাগাল।

রাহুল আর বাপিও ওর পিছন-পিছন এগোল।

গ্রিল ঘেরা বারান্দার একপাশে রাহুলদের সবার চটি-জুতো থাকে। সেটা গতকালই বোধহয় কোকোর নজরে পড়েছে। রাহুলরা যখন বারান্দায় এসে পৌঁছল ততক্ষণে রাহুলের মায়ের একজোড়া চটি পায়ে দিয়ে কোকো একেবারে বাউন্ডারির গেটে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে কোকো দু-হাতে হাতছানি দিয়ে রাহুলকে ডাকছে: ‘এই তো চটি পরেছি! রাহুল, তাড়াতাড়ি এসো...তাড়াতাড়ি...। আমি... বাজারে...যাব। বাজারে...।’

ওর কাণ্ড দেখে রাহুল হেসে ফেলল। বাপিও আর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। রাহুলের মা কখন যেন রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। কোকোর কাণ্ড দেখে হেসে বললেন, ‘ওইটুকু বাচ্চা! ও কখনও বোঝে কোন চটিটা ছেলেদের আর কোনটা মেয়েদের!’

‘ওইটুকু বাচ্চা!’ বাপি অবাক হয়ে মামের দিকে তাকাল ‘কী বলছ তুমি? ওর বয়েস কম করেও পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে।’

মাম কেমন একটা অদ্ভুত গলায় বললেন, ‘সে হোক গে। ক্যালেন্ডার দিয়ে কি সবসময় বয়েস মাপা যায় নাকি! ও আসলে একটা বাচ্চা ছেলে...।’

তো সেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ‘বাচ্চা’ ছেলেটা রাহুল আর বাপির সঙ্গে বাজারের পথ ধরল। রাহুল লক্ষ করল, চলার পথে কোকো অবাক হয়ে সব কিছু দেখছে। যেন ও সদ্য পৃথিবীতে এসে একের পর এক নতুন আবিষ্কার করে চলেছে। চকচকে উদগ্রীব চোখে ও দেখছে আকাশ,

সূর্য, গাছপালা, ফুল, পাখি, সাইকেল রিকশা, গোরুর গাড়ি, সাইকেল, মোটরবাইক, ভ্যান-রিকশা, টালির দোচালা-চারচালা ঘর, জল-কাদা, ঘাস, মানুষজন—আরও কত কী!

কোকোর চোখের দিকে তাকিয়ে রাহুলের মনে অনেক প্রশ্ন জাগছিল। মাস্টারজি, সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ, হাত-পায়ের ক্ষতচিহ্ন, কন্ট্রোল ব্যান্ড, ঘিয়া নদীর জলে ভেসে আসা একটা মানুষ...আরও কত বিষয় ঘিরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আবার একইসঙ্গে মনে পড়ছিল গতকালের সেই হাহাকার 'আমার...কেউ...নেই। মা...নেই। বাবা... নেই।' শিশু-যুবকটির তখনকার সর্বহারা অসহায় মুখের কথা মনে করে রাহুলের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ও তাকাল কোকোর দিকে। ওর মুখে এখন নতুন পৃথিবীর নতুন-নতুন জিনিস আবিষ্কারের আনন্দ।

বাজারে পৌঁছে অন্যান্য রবিবারের মতো বাপি প্রথমে আনাজপাতি কিনতে শুরু করলেন। সরু-সরু বাঁশের ডগায় পলিথিনের ছাউনি খাটিয়ে দোকানিরা বসেছে। কেউ রাস্তার ধারে, কেউ-বা রাস্তার লাগোয়া মাঠে। চারদিকের নানারকম শব্দ বলে দিচ্ছিল এটা একটা ব্যস্ত জায়গা। লোকজনের কথাবার্তা, সাইকেলের ঘণ্টি, ভ্যান-রিকশার প্যাঁক-প্যাঁক, মোটরবাইকের আওয়াজ—কতরকমের শব্দ! তিন-চাররকম সবজি কেনা হতেই কোকো জেদ করে, বায়না করে, সেই থলেটা বাপির হাত থেকে নিয়ে নিল। বলল, বাজারের একটা থলে ও বইবে, কারণ, ওর গায়ে জোর আছে।

এ-কথায় রাহুল যখন হেসে বলেছে, 'তোমার গায়ে জোর আছে মানে?'

তখন কোকো জবাব দিয়েছে, 'মাস্টারজি বলে। আমার...গায়ে খুব...জোর।'

রাহুল তখন অবাক হয়ে কোকোর দিকে তাকিয়েছে শুধু—কোনও কথা বলেনি।

ঘুরে-ঘুরে বাজার করার কাজ শেষ হল একসময়। বাপি, রাহুল আর কোকো বাড়ির পথ ধরল। অন্যান্য রবিবার রাহুল আর বাপি সাইকেল-রিকশায় ফেরেন। কিন্তু আজ কোকো সঙ্গে আছে—রিকশায় তিনজন আঁটবে না। তার ওপর তিন-তিনটে থলে।

ফেরার পথে রাহুল আর কোকো গল্প করছিল। রাহুল বলছিল, কোকো অবাক হয়ে শুনছিল। আর মাঝে-মাঝে চারপাশটা দেখছিল।

হঠাৎই দূরে একটা গোরুর গাড়ি দেখতে পেল রাহুল। অনেকগুলো বস্তা বোঝাই করে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে। রাস্তার খানাখন্দে পড়ে চাকাগুলো একবার ডানদিকে একবার বাঁ-দিকে হেলে যাচ্ছে।

রাহুল আঙুল তুলে গোরুর গাড়িটা কোকোকে দেখাল, বলল, 'ওই দ্যাখো, গোরুর গাড়ি...।'

'আমি...আগে...গোরুর গাড়ি...দেখেছি।' স্মৃতি খুঁজে পাওয়ার আনন্দে কোকোর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বাপি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। নীল আকাশে ছোট-ছোট মেঘ ভেসে আসছে সূর্যের কাছাকাছি। কয়েকটা লম্বা-লম্বা গাছ মাথা তুলে রয়েছে আকাশের দিকে। বাতাসে অল্প-অল্প নড়ছে।

বাপি মুগ্ধ চোখে আকাশটাকে দেখছিলেন। রাহুল বুঝতে পারছিল বাপির এখনই রং-তুলি নিয়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করছে। ছবি আঁকা বাপির একমাত্র শখ। সময় পেলেই জল রং আর তুলি নিয়ে বসে পড়েন। মাঠ, ঘাট, নদী, গাছপালা আঁকেন। বাপির কাছে রাহুল শুনেছে, এ ধরনের ছবিকে ল্যান্ডস্কেপ বলে।

রাহুল একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎই লোকজনের হইচই চিৎকারে ও চমকে উঠল। আকাশের দিক থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল সামনের দিকে।

গোরুর গাড়িটার একটা চাকা আচমকা ভেঙে কাত হয়ে গেছে। ফলে বস্তা-বোঝাই গাড়িটা হেলে পড়েছে রাস্তার ধারের নালার দিকে। কয়েকটা বস্তা ধীরে-ধীরে গড়িয়ে পড়ছে নালার গর্তে। মাথায় গামছা জড়ানো গাড়োয়ান হাতের ছিপটি ছুড়ে ফেলে লাফ দিয়েছে রাস্তায়। বলদ দুটো ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে।

লোকজন ছুটে যাচ্ছিল বিপজ্জনক-ভাবে হেলে পড়া গাড়িটার দিকে। মনে হচ্ছিল, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গোরুর গাড়িটা বস্তাসমেত নালায় গড়িয়ে পড়বে। গতকালের বৃষ্টির জল নালায় জমে আছে। এর মধ্যেই গড়িয়ে পড়া তিনটে বস্তা জলে ভিজে একসা। ভেজা বস্তা দেখে রাহুল বুঝল, বস্তায় আলু আছে।

হাতের থলেটা রাস্তায় নামিয়ে রেখে কোকো কখন যেন ছুট লাগিয়েছিল।

রাহুল পিছন থেকে 'কোকো! কোকো!' বলে চিৎকার করে ওকে ডাকতে লাগল। কিন্তু ছেলেটা শুনলে তো!

রাহুল দেখল, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কোকো হেলে পড়া গোরুর গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল। ঝুঁকে পড়ে গাড়িটার লম্বা বাঁশের কাঠামোর নীচে কাঁধ লাগিয়ে প্রাণপণে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। ওর ফরসা মুখ লাল হয়ে গেল, চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল। মরিয়া হয়ে ও হেলে পড়া গাড়িটাকে চাগিয়ে তুলতে লাগল।

রাস্তার একপাশে বাজারের থলে নামিয়ে রেখে বাপির দিকে একবার তাকিয়েই রাহুল ছুটতে শুরু করেছিল। ও যখন গোরুর গাড়িটার কাছে এসে পৌঁছল তখন গাড়ির হেলে পড়া দিকটা অনেকটা সোজা হয়ে গেছে। কোকোর হাতের শিরা ফুলে উঠেছে, গলার শিরা ফুলে উঠেছে। ও দম বন্ধ করে অবাক করা শক্তিতে গাড়িটাকে ঠেলে তুলে একটু-একটু করে সোজা করছে।

ততক্ষণে রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। লোকজন হইহই চিৎকার করে কোকোর এই অলৌকিক কাণ্ড দেখছে। বলদ দুটোর ঘাড়ের যন্ত্রণা কমে যাওয়ায় ওরা চিৎকার বন্ধ করেছে।

ভিড়ের মধ্যে কে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'সবাই কাঁধ লাগাও, ভাই—এসো!'

সঙ্গে-সঙ্গে শোরগোল উঠল। পাঁচ-ছ'জন মানুষ ছুটে গিয়ে কোকোর পাশাপাশি কাঁধ লাগাল। আওয়াজ তুলল, 'মারো জোয়ান হেঁইয়ো...।'

গাড়ির বিশাল চাকাটা নালার ঢালে কাত হয়ে পড়েছিল। কয়েকজন সেটা তুলে এনে গাড়ির পাশ থেকে বেরিয়ে থাকা রডে লাগিয়ে দিল। গোরুর গাড়িটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওটার চাকার হুড়কোটা ভেঙে গিয়েছিল। তাই নতুন একটা লোহার হুড়কো জোগাড় করতে দুজন সাইকেল চেপে রওনা হয়ে গেল।

কোকো গাড়িটা ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। হাঁপাচ্ছিল আর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে দু-হাত জামায় ঘষে-ঘষে মুছছিল।

রাহুল চেঁচিয়ে ওকে ডাকল, 'কোকো...এদিকে এসো...।'

কোকো ফিরে তাকাল। রাহুলকে দেখতে পেল। হেসে হাত নাড়ল। তারপর রাহুলের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু ও আসবে কী! লোকজন ওকে ঘিরে ধরে সাবাশ দিতে লাগল।

'বাব্বাঃ, তোমার গায়ে তো হেভি জোর!'

'তুমি কে হে? তোমার নাম কী? তোমাকে তো এ এলাকায় আগে দেখিনি! তবে হ্যাঁ, তোমার হিম্মৎ আছে বটে!'

'সাবাশ, ভাই! একটা দারুণ জিনিস দেখালে!'

'ওকে একটা প্রাইজ দেওয়া উচিত।'

'তোমার গলায় ওটা কী বলো তো? এরকম পিকিউলিয়ার হার তো আগে দেখিনি....।'

রাহুল তাড়াতাড়ি জটলার মধ্যে ঢুকে পড়ে কোকোর হাত ধরল। ওকে টেনে নিয়ে এল বাইরে। জনতার মধ্যে থেকে উৎসাহী কয়েকজন হাত বাড়িয়ে কোকোর পিঠ চাপড়ে দিল।

বাপি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওদের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। রাহুলকে বললেন, 'শিগগির বাজারের থলে দুটো তুলে নিয়ে চল। এক্ষুনি নানান জন এসে কোকোকে নিয়ে হাজারটা প্রশ্ন করবে...তখন মুশকিল হবে....।'

রাহুল আর কোকো চটপট ওদের থলে দুটো তুলে নিয়ে এল। তারপর ওরা তিনজনে জলদি পায়ে হাঁটা লাগাল বাড়ির দিকে।

কিন্তু নিরাপদে বাড়ি পৌঁছনো হল না।

গোরুর গাড়ির ঘটনার জায়গা ছেড়ে বিশ-পঁচিশ পা যেতে না যেতেই রথপতি গুপ্তর সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক একসময়ে পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। এখন আর নেই। রেডিমেড জামা-কাপড়ের ব্যাবসা করেন। কলকাতার কয়েকটা নামী দোকানে ছেলেমেয়েদের শৌখিন পোশাক সাপ্লাই করেন।

রাহুলের বাপির সঙ্গে রথপতির বেশ ভালোই আলাপ। ভদ্রলোক সবসময় পাড়াপড়শির হাঁড়ির খবরের খোঁজ করে বেড়ান। সেটা বিরক্তিকর হলেও লোকজনের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়ান। বিপদে আন্তরিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

রাহুলের বাপির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন রথপতি। হেসে জিগ্যেস করলেন, 'কেমন আছেন, কল্যাণবাবু?'

'ভালো। আপনি কেমন আছেন?'

'চলে যাচ্ছে আর কী!' কোকোর দিকে তাকালেন রথপতি। আঙুল নেড়ে বললেন, 'এই ছেলেটির জন্যে আজ গর্বে বুক ফুলে উঠছে। আমি ওই রিকশা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। ওর সাহস আর শক্তির প্রশংসা করতে হয়। পরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া একটা বিশাল গুণ। কী নাম তোমার?'

কোকো কর্কশ গলায় বলল, 'কোকো...।'

'সাবাশ, কোকো!' কোকোর পিঠ চাপড়ে দিলেন রথপতি। তারপর চোখ সরু করে কল্যাণবাবুর দিকে তাকালেন 'কোকো আপনার কে হয়? ওকে তো আগে কখনও মণিমেলায়...মানে, আমাদের এ-গাঁয়ে দেখিনি—।'

কল্যাণবাবু উত্তর দিতে একটুও দেরি করলেন না। গতকাল রাতে ভেবে-ভেবে তিনি গল্পটা তৈরি করে নিয়েছেন।

'ও আমার পিসতুতো দাদার ছেলে—শ্রীরামপুরে থাকে। ওর একটু সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম আছে। ওখানে ডক্টরের ট্রিটমেন্টে আছে। তিনিই বলেছেন, কিছুদিন গ্রামের হাওয়া খেয়ে আসতে। মানে, গাছপালা মাঠ-ঘাটের কাছাকাছি থাকলে ওর প্রবলেমটা তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে...।'

'কী প্রবলেম ওর?'

এতটা খোঁচানো কোশ্চেন রাহুলের বাপি আশা করেননি। তাই একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'এই...মানে...ওর মধ্যে একটা বাচ্চা-বাচ্চা ভাব আছে। যদিও ওর বয়েস প্রায় সাতাশ। তা ছাড়া গলাটা কেমন হোর্স...ধীরে-ধীরে কথা বলে...।'

রথপতি গুপ্ত ভুরু কোঁচকালেন। আজব প্রাণী দেখার দৃষ্টিতে কোকোর দিকে তাকালেন 'ওর গলার ওই লোহার বালাটা কীসের?'

কল্যাণবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'ওটা একটা মেডিক্যাল ইলেকট্রনিক ব্যান্ড। ট্রিটমেন্টের জন্যে ওর ডক্টর দিয়েছেন।'

'বাব্বা! এসব তো বাপের জন্মে কখনও দেখিনি। এ আবার কী ধরনের রোগ?'

'অ্যাকিউট মাল্‌টিপ্‌ল সাইকো-প্যাথলজিক্যাল চাইল্ড সিনড্রোম। মানে, ওর সাইকিয়াট্রিস্ট তাই বলেছেন...।'

এত লম্বা-চওড়া নামে রথপতি বেশ ঘাবড়ে গেলেন। আর কোনও প্রশ্ন করলেন না।

কল্যাণ জানতেন যে, রথপতি বেশিদূর লেখাপড়া শেখেননি। তাই ওঁর অন্তর-খোঁচানো প্রশ্নমালা ঠেকানোর জন্য যা পেরেছেন বানিয়ে একটা খটমট রোগের নাম বলে দিয়েছেন। এ-নামে সত্যিই কোনও রোগ হয় কি না তিনি জানেন না।

'ও, আচ্ছা। তা ও তাড়াতাড়ি সেরে উঠুক।' আবার কোকোর পিঠ চাপড়ে দিলেন রথপতি 'তুমি বড় ভালো ছেলে, বাবা। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো।'

সামান্য হেসে রথপতি গুপ্ত চলে গেলেন।

রাহুল বলল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো, বাপি। নইলে কোকোকে নিয়ে আরও সবাই প্রশ্ন করবে।'

বাপি 'হ্যাঁ—চল।' বলে তাড়াতাড়ি পা চালালেন বটে, কিন্তু ওঁর মনে উদ্বেগ থেকেই গেল।

বাজারে কয়েকজন কোকোর কথা জিগ্যেস করেছে। তখন মোটামুটি এরকম সাফাই দিয়েই ম্যানেজ করেছেন কল্যাণ। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন, এই উত্তরে বেশিদিন চলবে না, কারণ, কোকোকে যে ঘিয়া নদীর পাড়ে পাওয়া গেছে এ-কথা আজ নয় কাল জানাজানি হবেই। তখন কী হবে?

বাপি আর ভাবতে পারছিলেন না। আনমনা ভাবে পা ফেলতে লাগলেন।

রাহুল আর কোকো পাশাপাশি হাঁটছিল। কোকো হঠাৎই রাহুলকে লক্ষ করে বলল, 'রাহুল, আমার অ্যাক্সিডেন্ট...চাইল্ড হয়েছে। আমার সাইকিয়া...বলেছে।'

ওর দিকে তাকিয়ে রাহুল আর বাপি দুজনেই হেসে ফেললেন।

কোকো বাঁ-হাতটা পেটে দিয়ে বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে...।'

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি চলো, বাড়ি গিয়ে খাবে।' রাহুল বলল।

কোকো খুশিতে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল 'কী মজা! আমি...বাড়ি...গিয়ে খাব...খাব।'

।। চার ।।

কোকোকে নিয়ে ভীষণ মুশকিলে পড়ে গেল রাহুল। ও কিছুতেই রাহুলকে কাছ-ছাড়া করতে চায় না। সোমবার রাহুল স্কুলে যাওয়া শুরু করতেই কোকোরও বায়না শুরু হয়ে গেল 'আমি রাহুলের সঙ্গে যাব। আমি...যাব।'

শেষ পর্যন্ত ব্যাপার এমন দাঁড়াল যে, কোকো বাচ্চা ছেলের মতো কান্নাকাটি দাপাদাপি শুরু করে দিল।

বাপি আগেই অফিসে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বেগতিক দেখে রাহুলের মা কল্যাণবাবুকে ফোন করলেন।

সব শুনে বাপি বললেন, 'ঠিক আছে। বায়না করছে যখন তুমি আর ও রাহুলের সঙ্গে যাও। রাহুলকে স্কুলে দিয়ে তোমরা আবার ফিরে এসো। কোকো তো আসলে বাচ্চা ছেলে! শুধু দেখতেই যা বড়সড়। ও কি অত বোঝে?'

অগত্যা তাই হল। মাম, কোকো আর রাহুল স্কুলের পথ ধরল।

স্কুল বেশি দূরে নয়। হাঁটা পথে স্কুলে যেতে-যেতে রাহুল কোকোকে অনেক গল্প বলছিল। স্কুলের গল্প, ফুটবল খেলার গল্প, গাঁয়ের মেলার গল্প, দুর্গাপুজোর সময় যে বিশাল উৎসব হয় তার গল্প।

কোকোর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ও অন্য কোনও গ্রহের প্রাণী। এসব ব্যাপার যেন ও প্রথম জানছে রাহুলের কাছে।

রাহুলকে স্কুলে দিয়ে মাম কোকোকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। কোকো বারবার জিগ্যেস করতে লাগল, রাহুল কখন ফিরবে। মাম ওকে কোনওরকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলেন।

কোকো কিন্তু বাড়িতে বসে-বসে সময় কাটাল না। রাহুলের মা-কে সাহায্য করার জন্য পাগল হয়ে উঠল। মামের কোনও বারণ শুনল না।

টিউবওয়েল পাম্প করে-করে ও বালতি-বালতি জলের জোগান দিতে লাগল। কাচা জামাকাপড় দড়িতে ছড়াতে লাগল। ঘরোয়া ফাইফরমাশ

খাটতে লাগল। এ ছাড়া বাকি সময়টা কোকো বাগানে ঘুরে কাটাল। কখনও ফুল দেখতে লাগল, আবার কখনও পাখির খোঁজে হাঁ করে গাছের ঘন পাতার দিকে চেয়ে রইল। বিকেলের দিকে ও বাগানের একপাশে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম সেরে নিল।

রাহুলের মা কোকোর 'কীর্তি' দেখছিলেন।

দেখছিলেন কত সহজে আর কত তাড়াতাড়ি ও টিউবওয়েল পাম্প করে জল তুলছে। ওর সহজ ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন ও একটা খেলনা টিউবওয়েল পাম্প করছে। এ ছাড়া ঘরের ভেতর থেকে কোকোর ব্যায়ামও দেখছিলেন। জামা খুলে খালি গায়ে ও দাঁড়িয়ে ছিল। তারিফ করার মতো ঝকঝকে স্বাস্থ্য—সিনেমায় যেমন দেখা যায়। শুধু ফরসা বুকে কয়েকটা সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ। মাম বুঝলেন, মাস্টারজি মানুষটি এই ভোলাভালা শিশু-যুবকের ওপরে কম অত্যাচার করেননি!

কোকো প্রথমে খালি হাতে ব্যায়াম শুরু করল। ডন-বৈঠক ইত্যাদি শেষ করার পর ও বাগানের পাঁচিলের পাশ থেকে শ্যাওলা পড়া দুটো থান ইট তুলে নিল। সেগুলোকে ডাম্বেলের মতো ব্যবহার করে ও আবার শরীরচর্চা শুরু করল। ওর সারা গা ঘেমে উঠল, শরীরটা চকচক করতে লাগল।

রাহুল স্কুল থেকে ফেরার পর কোকো আবার ওর ল্যাংবোট হয়ে ঘুরতে শুরু করল। ওর সঙ্গে খেলার মাঠে গেল। তারপর ওর সঙ্গে পড়তে বসে গেল। রাহুল একটা খাতা দিয়ে ওকে 'অ-আ-ক-খ' লিখতে বলল। কোকো অনভ্যস্ত হাতে আঁকাবাঁকা রেখায় বর্ণগুলো লিখে চলল।

কয়েকদিনের মধ্যেই কোকো রাহুলের স্কুল ভালোমতন চিনে নিল। এখন আর মামকে ওর সঙ্গে যেতে হয় না। কোকো যদি সুস্থ স্বাভাবিক হত তা হলে বলা যেত ও-ই রাহুলকে স্কুলে দিয়ে আসে, আবার ছুটির সময় নিয়ে আসে। রাহুলের সঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলতে যায়, তারপর সন্ধেবেলা পড়তে বসে। 'অ-আ-ক-খ', 'এ-বি-সি-ডি' কিংবা '১ থেকে ১০০' লিখতে শেখে। ওর লেখাপড়ার ধরন দেখে বোঝা যায়, কোকো কয়েক বছর স্কুলে গিয়েছিল। তারপর কোনও কারণে ওর পড়াশোনা থেমে যায়।

কখনও-কখনও কোকো রাহুলের বাপি কিংবা মামের কাছেও পড়তে বসে। আবার বাপি যখন জল রং সাজিয়ে নিয়ে ছবি আঁকতে বসেন তখন কোকো বাপির পাশে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। মুগ্ধ হয়ে ছবি আঁকা দ্যাখে।

একদিন ছবি আঁকতে-আঁকতে বাপি ওকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি ছোটবেলায় ছবি আঁকতে?'

'না...আমি...আঁকতাম না।'

তুলি হাতে নিয়ে হ্যান্ডমেড পেপারে হালকা নীলের ওয়াশ টেনে বাপি বললেন, 'তুমি ছবি ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় কাত করে কোকো বলল।

'তুমি ছবি আঁকা শিখবে?'

আবার ঘাড় কাত করল কোকো। হ্যাঁ, ও ছবি আঁকা শিখবে।

'গুড বয়। কাল থেকে তোমাকে আমি আঁকা শেখাব।'

'আমার...মা...আমাকে ছবি আঁকা... শেখাত। মা খুব সুন্দর ছবি...আঁকত। মা...আর...নেই।'

বাপি অবাক হয়ে দেখলেন কোকোর চোখে জল।

ওকে কাছে টেনে নিলেন কল্যাণবাবু। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোমার মা-কে মনে আছে?'

কোকো বিহ্বলভাবে মাথা নাড়ল। বলল, 'না...মনে নেই। শুধু ছবি আঁকা...মনে আছে।'

তারপরই কোকো চুপ করে গেল। গুম হয়ে বসে রইল। অনেক প্রশ্ন করেও কল্যাণবাবু ওর কাছ থেকে আর কোনও কথা বের করতে পারলেন না।

এর আগেও কোকোকে ওর বাড়ির কথা, বাবা-মায়ের কথা অনেকবার জিগ্যেস করেছেন, কিন্তু কোনও স্পষ্ট উত্তর পাননি। রাহুল আর ওর মা-ও বহুবার সরাসরি অথবা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কোকোকে ওর বাড়ির কথা জিগ্যেস করেছেন, বাবা-মায়ের কথা জিগ্যেস করেছেন, কিন্তু কোনও জবাব পাননি।

আজ প্রথম বাপি জানতে পারলেন, কোকোর মা ছবি আঁকতেন। হয় সবকিছু কোকোর ধীরে-ধীরে মনে পড়ছে, অথবা, ও ধীরে-ধীরে

নিজেকে মেলে ধরছে। ঠিক যেভাবে একটা গোলাপ কুঁড়ি থেকে ধীরে-ধীরে পাপড়ি মেলে ধরে।

রাহুলের বাপি আর মাম কোকোকে ওঁদের স্বাভাবিক জীবনে মিশিয়ে নিলেন। কেন জানি না, ওঁদের মনে হয়েছিল, এতে কোকো তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। যদি কোনও পুরোনো স্মৃতি ওর হারিয়েও গিয়ে থাকে, তা হলে সেটা ফিরে আসবে।

কোকো ওঁদের কথা শুনে চলত বটে তবে দুটি ব্যাপার ছাড়া। প্রথমটা হল, রাহুলের পাশে-পাশে ছায়ার মতো ঘোরা। আর দ্বিতীয়টা ঘরের নানান কাজে মাম এবং বাপিকে সাহায্য করা।

একদিন রাহুলের সঙ্গে মাঠে খেলতে গিয়ে এক কাণ্ড হল।

এমনিতে রোজ যে কোকো যায় ও কিন্তু খেলতে নামে না। মাঠের ধারে চুপচাপ বসে রাহুলদের ফুটবল খেলা দ্যাখে। আর গোল-টোল হলে হাততালি দেয়। হাত ছুড়ে চেঁচামেচি করে।

কিন্তু সেদিন ওর কী খেয়াল চাপল, ও রাহুলের কাছে বায়না করে বসল।

‘রাহুল, আমি...তোমার মতো...বল খেলব।’

ওর বায়নার ধরন রাহুল জানে। একটা কিছু মাথায় ঢুকলে ও সেটাই ঘ্যানঘ্যান করে যাবে। তাই ও বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে কোকোকে নিজের দলে নিল। ও ভেবেছিল, মিনিট পাঁচ-দশ খেলানোর পর কোকোকে ঠান্ডা করে বসিয়ে দেবে। কিন্তু কাজে সেটা করা গেল না। কারণ, কোকোর খেলা রাহুলকে অবাক করে দিল।

না, কোকো ফুটবল খেলতে জানে না। তবে কচিৎ কখনও পায়ে বল পেয়ে গেলে ও যে-অসম্ভব জোরে শট মারছে তা দেখে সকলের চোখ ছানাবড়া।

কোকোর একটা জোরালো শট কোমরে লেগে নিধু ছিটকে পড়ে গেল। পড়ে ছটফট করতে লাগল।

রাহুলরা সবাই ছুটে গেল ওর তদারকি করতে।

গোপাল, রাহুল বেশ অবাক হয়ে গেল। নিধু ফুটবল খেলে ভালো। চেহারাও গাঁট্টাগোট্টা, পেটানো, সহজে ওকে কেউ কাবু হতে দেখেনি। কিন্তু আজ ওর অবস্থা ভেজা তুলোর মতো।

নিধুকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। কোকো একাই ওকে চাগিয়ে কাঁধে তুলে নিল। মাঠের ধারে ওকে শুইয়ে দিয়ে সবাই মিলে পরিচর্যা করতে লাগল।

একটু পরে খেলা আবার শুরু হল।

কোকো হঠাৎ পায়ে বল পেয়ে তীরবেগে ছুটতে শুরু করল। সেরকম অভ্যাস স্বাভাবিকভাবেই না থাকায় বল ওর পা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও একছুটে বলের কাছে পৌঁছে গেল। এবং শট মারল।

বলটা গোলে ঢুকল। শুধু ঢুকল নয়, একেবারে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল।

গোলপোস্টের দশ-বারো হাত পিছনেই ছিল স্বদেশ মণ্ডলদের বাঁখারির বেড়া। জাল ছিঁড়ে বেরোনো বলের ধাক্কায় সেই বেড়াটাও কাত হয়ে গেল।

গোলের আনন্দে রাহুলদের দলের সবাই হইহই করে উঠেছিল। কিন্তু দেখা গেল গোল খাওয়া দলের বন্ধুরাও স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে কোকোকে ঘিরে উৎসব শুরু করে দিল। কারণ, এরকম ভয়ংকর তীব্র শট মণিমেলায় আগে কেউ কখনও দেখেনি। মণিমেলায় শট মারার একটা প্লেয়ার পাওয়া গেল বটে! কোকো ফুটবল খেলতে না জানুক, শট তো মারতে পারে! ওকে রাহুলরা প্র্যাকটিস করিয়ে-করিয়ে খেলাটা একটু-আধটু রপ্ত করিয়ে দেবে। তারপর ও দু-চারটে শট মেরে বাজিমাত করবে। মণিমেলার ফুটবল টিমে ওকে খেলাতে হবেই।

খেলার শেষে রাহুল, দীপায়ন আর কোকো বাড়ির দিকে ফিরছিল।

মাঠ ছেড়ে ওরা পিচের রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। হঠাৎই একটা বিশাল মোটর-বাইক গাঁক-গাঁক শব্দ তুলে ওদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। বাইকে তিনটে ছেলে ঘেঁষাঘেষি করে বসেছিল। তিনজনেরই গায়ে স্লিভলেস ভেস্ট, আর বারমুডা। কী এক উল্লাসে চিৎকার করছে।

বাইকটা যেভাবে কাত করে-করে সাপের মতো এঁকেবেঁকে ওরা চালিয়ে গেল তাতে রাহুল ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওর মানে হল, এক্ষুনি বুঝি বাইকটা উলটে যাবে।

দীপায়ন বলে উঠল, 'কী রাফ চালাচ্ছে! আর-একটু হলেই অ্যাকসিডেন্ট করত।'

রাহুল বলল, 'মাকুর বাইক। বাইকে মাকু, ওর ভাই নেনে, আর বর্মনবাড়ির ছোটছেলেটা—কী নাম যেন—ওটা বসে আছে। মাকু তো এভাবেই বাইক চালায়—।'

'মাকু' নামটা শোনামাত্রই দীপায়ন চুপ করে গেল। কোনও এলাকায় যে-নাম শোনামাত্র সবাই মুখে কুলুপ আঁটে 'মাকু' সেরকমই একটা নাম। ওর চ্যাংড়া ছোটলোক সাঙ্গপাঙ্গদের সবাই এড়িয়ে চলে। বর্মনবাড়ির ছোটছেলেটা এ-দলে নতুন জুটেছে। ছেলেটা এখনও স্কুলে যায়, তবে চালচলন বড়লোকের বখাটে ছেলের মতন।

রাহুল আর দীপায়ন নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় মাকুর সমালোচনা করছিল। তার সঙ্গে বলছিল নেনের কীর্তিকথা। ওরা খেয়াল করেনি, কোকো হাঁ করে ওদের কথাগুলো গিলছিল।

বিকেল ফুরিয়ে এলেও আলো ফুরোয়নি। খেলা শেষ করে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ির দিকে ফিরছে। নিজেদের মধ্যে ওরা যেরকম কথার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে সন্ধেবেলা বটগাছের আশ্রয়ে ফেরার পর পাখির ঝাঁক কিচিরমিচির করে ঝগড়া করছে।

হঠাৎই মোটরবাইকটা আবার ফিরে এল। মনে হল, বাইকটা একই রাস্তা ধরে চক্কর কাটছে। সেই সাপের মতো আঁকাবাঁকা গতি। সঙ্গে হইহই চিৎকার।

বাইকটার বিকট হর্ন বাজছিল।

ওটা আচমকা এসে পড়ায় বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারল ছিটকে গেল। বাইকটার সর্পিল গতি ওদের ভয় পাইয়ে দিল। ওরা মিহি গলায় চিৎকার করতে লাগল।

বাইকটা একটা বাচ্চা মেয়েকে প্রায় চাপা দিয়ে ফেলছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে মাকু ব্রেক কষে বাইকটাকে থামাল।

বাচ্চা মেয়েটা ভয় পেয়ে টাল সামলাতে না পেরে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। চিত হয়ে বাইকটার চাকার দিকে তাকিয়ে মেয়েটা 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে ফেলল।

বাচ্চাদের ভয় পেয়ে দৌড়ো দৌড়ির কাণ্ড দেখে আর কান্না শুনে

মাকুরা বোধহয় মজা পেল। ওরা তিনজনে বাইকে বসে-বসেই হাসতে শুরু করল। তারই মাঝে মাকু রাস্তায় পড়ে থাকা বাচ্চা মেয়েটাকে লক্ষ করে হাত নেড়ে বলে উঠল, 'কাঁদে না, খুকু। তোমার কিচ্ছু হয়নি। তুমি মিছিমিছি কাঁদছ। এসো...হাত ধরো। উঠে পড়ো...।'

বাচ্চা মেয়েটা ভ্যাবাচ্যাকা মুখে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। নিজের হাত-পা জামা ঝাড়তে লাগল।

মাকুদের হাসি রাহুলের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল। ও তেমন করে কিছু না ভেবেই বাইকটার কাছে এগিয়ে গেল। মাকুকে লক্ষ করে জেহাদি প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

'এসব কী হচ্ছে?'

'তোর বাপের বিয়ে হচ্ছে।' বলেই বাইকে বসা অবস্থাতেই রাহুলের বুকে পা তুলে দিল মাকু। সজোরে এক ঠেলা মারল।

লাথি খেয়ে রাহুল ছিটকে পড়ল রাস্তায়। মাথা ঠুকে গেল। যন্ত্রণার একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

রাহুল উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল। দীপায়ন তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে ওকে হাত ধরে টেনে তুলতে লাগল।

মাকুরা বাইকে বসে মজা দেখছিল। ওদের বাইকের ইঞ্জিন ভটভট শব্দ করছিল। রাহুল উঠে দাঁড়াতেই মাকু আর নেনে ওকে নোংরা ভাষায় গালাগাল দিল। তারপর মাকু বলল, 'এই আজব ভেড়াটাকে মেপে রাখ। পরে একে কড়া পালিশ দেব। সালার এত হিম্মত যে, আমার সঙ্গে মুখ লাগাতে আসে!'

রাহুল হাত-পায়ের ধুলো ঝাড়ছিল আর ঘেন্না-মেশানো প্রতিবাদের চোখে মাকুর দিকে দেখছিল।

সেটা লক্ষ করে ভাইয়ের দিকে ঘাড় ঘোরাল মাকু 'অ্যাই নেনে, নাম তো বাইক থেকে। দ্যাখ, ব্যাটা ড্যাবড্যাব করে কেমন তাকাচ্ছে! মালটাকে একটু পাঁচালি পড়ে দে...।'

নেনে হাসল। হাসতে-হাসতেই বাইক থেকে নামল। তারপর রাহুলের দিকে পা বাড়াল।

কোকো এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। খানিকটা বিভ্রান্তভাবে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। যেন কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

কিন্তু নেনে রাহুলের দিকে আক্রমণের ভঙ্গিতে এগোতেই কোকো নড়েচড়ে উঠল। একছুটে নেনের সামনে গিয়ে ওর পথ আগলে দাঁড়াল। কর্কশ গলায় টেনে-টেনে বলল, 'রাহুলকে...মারবে না।'

'তাই?' বলে নেনে ডানহাতে সপাটে এক ঘুসি বসিয়ে দিল কোকোর মুখে।

কোকো ঘুসির অভিঘাতটা নিল, কিন্তু জায়গা থেকে নড়ল না—দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মতো। ওর ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল।

ও আবার বলল, 'রাহুলকে...মারবে না।'

রাহুল 'কোকো! কোকো, চলে এসো—' বলে অস্থিরভাবে ওকে ডাকছিল। কিন্তু কোকো তাতে এতটুকু কান দিল বলে মনে হল না।

'রাহুলকে...মারবে না।' একঘেয়ে ভাবে আবার বলল কোকো।

ওর অদ্ভুত কথা বলার ঢঙে নেনে হেসে উঠল 'কে রে আমার তোতলা কাত্তিক?' তারপর ভেংচিয়ে বলল, 'রাহুলকে মাব্ব না, ছোনা?'

কথা বলতে-বলতেই নেনে হাত তুলেছিল, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

রাহুলরা অবাক হয়ে কোকোর কাণ্ড দেখতে লাগল।

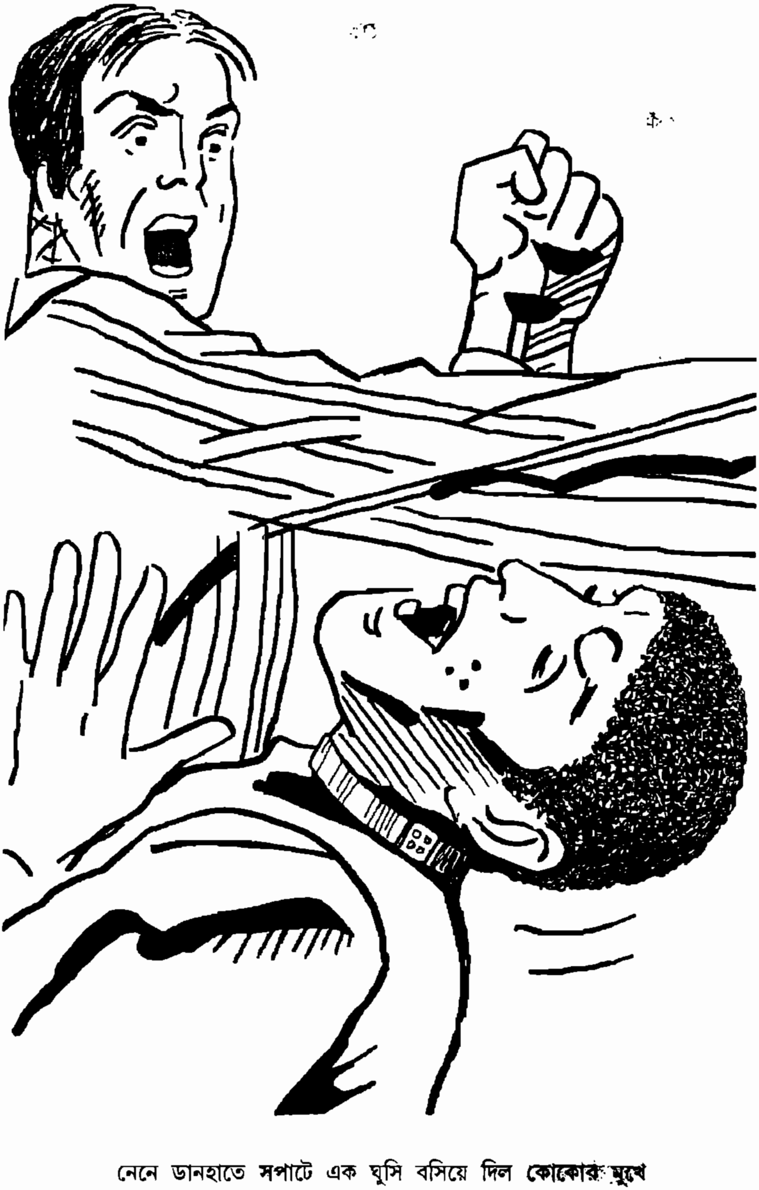
এক ঝটকায় নেনের কোমর জাপটে ধরল কোকো। তারপর অবলীলায় ওকে শূন্যে তুলে ফেলল।

নেনে দাপাদাপি করছিল। কোকোকে কিল-চড়-ঘুসি মারছিল। কিন্তু কোকো সেসব গ্রাহ্য করছিল না। ও অনায়াসভঙ্গিতে হেঁটে গেল রাস্তার কিনারায়। তারপর নেনেকে স্রেফ ছুড়ে দিল নালার ওপারে। নেনে গিয়ে আছড়ে পড়ল একটা পরিত্যক্ত জমিতে।

বাইকে বসে মাকু গর্জন করে উঠল। সেইসঙ্গে গালাগালের ফোয়ারা ছোটাল। কিন্তু ও বাইক থেকে নামেনি। বোধহয় শত্রুর এইরকম ভয়ংকর শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না সে-কথাই ভাবছিল। আর বাইকের পিছনে বসে থাকা বড়লোকের বখাটে ছেলেটা ভয়ের চোখে কোকোর দিকে তাকিয়ে ছিল।

কোকো অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় মাকুর বাইকের সামনে এসে দাঁড়াল।

মাকু গিয়ার বদল করে বাইক ছুটিয়ে দিল। ওর বোধহয় কোকোকে চাপা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেটা হল না।



নেনে ডানহাতে সপাটে এক ঘুসি বসিয়ে দিল কোকোর মুখে

কারণ, কোকো শক্ত দু-হাতে বাইকের হাতল চেপে ধরেছে। মাকুর হাতের পাশেই কোকোর নীল শিরা ওঠা দুটো হাত।

বাইকটা গোঁ-গোঁ গর্জন করছিল, কিন্তু নড়তে পারছিল না। কোকো সামনে ঝুঁকে পড়ে চোয়ালে চোয়াল চেপে বাইকের অশ্বশক্তির টক্কর নিচ্ছিল। রাহুল আর দীপায়ন স্তম্ভিত হয়ে কোকোর কাণ্ড দেখছিল।

রাস্তায় ভিড় জমছিল। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো তো ছিলই, তার সঙ্গে জুটে গেল পথচারীরা। কেউ হেঁটে যাচ্ছিল, কেউ-বা সাইকেলে।

বাইকটাকে ক্ষমতার শেষ সীমায় নিয়ে গেল মাকু। আকাশফাটানো গোঁ-গোঁ গর্জন। ধোঁয়া। পেট্রলের গন্ধ।

কিন্তু কোকো অবিচল। সবার চোখের সামনে ও যেন এক রূপকথার সার্কাস দেখাচ্ছে।

ও দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'বাইকের...স্টার্ট বন্ধ...করো। নইলে বাইক...উলটে...দেব...।'

ওর কথায় বোধহয় ম্যাজিক ছিল, কারণ, মাকু কী একটা সুইচ ঘোরাতেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বাইকের ইঞ্জিন থেমে গেল। কোকো বাইকের হ্যান্ডেল ধরে হাঁপাতে লাগল।

নেনে কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু নালা পেরিয়ে কোকোর আক্রমণের আওতায় আসতে ভয় পাচ্ছিল। আর বর্মনবাড়ির ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছিল এখুনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে।

রাহুলই প্রথম সংবিৎ ফিরে পেল। ও 'কোকো! কোকো!' বলে চিৎকার করে ছুটে এল ওর 'অলৌকিক' বন্ধুর কাছে। ওকে পিছন থেকে একেবারে জাপটে ধরল।

'কোকো! কোকো!' আবেগে রাহুলের চোখে জল এসে গেল।

কোকো বাইক ছেড়ে দিয়ে রাহুলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমাকে যে মারবে...তাকে ছাড়ব না। ছাড়ব না।'

কোকোকে অন্যমনস্ক দেখে নেনে সামান্য খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে নালা পেরোল। তারপর চট করে বাইকে উঠে বসল। সুযোগ বুঝে মাকুও

বাইকে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। তবে যাওয়ার আগে কোকো আর রাহুলকে লক্ষ করে গালাগাল দিয়ে গেল। চিৎকার করে বলে গেল, 'ওয়েট কর—তোদের হিসেব হবে।'

রাহুল আর কোকো মাকুদের চলে যাওয়া দেখল।

রাস্তার লোকজন এতক্ষণ যেন রুদ্ধশ্বাসে কোনও সিনেমা দেখছিল। বাইকটা চলে যেতেই সবাই কোকোর কাছে ছুটে এল। আলোচনা করতে লাগল, হইচই করতে লাগল, কোকোর সাহস আর শক্তির তারিফ করতে লাগল।

কোকোকে নিয়ে প্রশ্নও করতে লাগল কেউ-কেউ।

'একে তো এ-গাঁয়ে আগে দেখিনি!'

'ছেলেটার গলায় ওটা কী?'

'ও কাদের বাড়িতে এসেছে?'

'ওর নাম কী?'

কোকো কোনও কথায় কর্ণপাত করছিল না। ও এমনভাবে রাহুলের একটা হাত জড়িয়ে ধরে ছিল যেন হাতটা ছেড়ে দিলেই ও হারিয়ে যাবে। দীপায়নও রাহুলের কাছা-কাছি দাঁড়িয়ে ছিল। ও রাহুলকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্য তাড়া লাগাচ্ছিল।

রাহুল কোকোর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, কোকো। ওই বাজে ছেলেগুলোর সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালে কেন? জানো, ওরা গুন্ডা-মাস্তান?'

'গুন্ডা কাকে বলে? মাস্তান...কী?' সরল মুখে রাহুলের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল কোকো।

রাহুল ওকে হাত ধরে টানল। হাঁটতে শুরু করল। পিছনে দীপায়ন।

হাঁটতে-হাঁটতেই রাহুল বলল, 'গুন্ডা। মাস্তান। ওদের সঙ্গে ছোরা থাকে, রিভলভার থাকে। ওরা খারাপ।'

কোকো রাহুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাস্টারজির কাছে...রিভলভার আছে। মাস্টারজি...খারাপ।'

রাহুল অবাক হলেও কোনও কথা বলল না। ওকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

দীপায়ন রাহুলকে জিগ্যেস করল, 'মাস্টারজি আবার কে?'

ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্য রাহুল ঠোঁট উলটে বলল, 'কী জানি! ও মাঝে-মাঝেই ওরকম উলটোপালটা কথা বলে।'

দীপায়ন বলল, 'আমার তো চিন্তা হচ্ছে রে। মাকুরা সহজে ছাড়বে না।'

চিন্তা রাহুলেরও হচ্ছিল। মাকু, নেনে ওরা মোটেই সুবিধের নয়। ওরা দোকানদারদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে তোলা আদায় করে। সুযোগ পেলে ছিনতাই করে, ওয়াগন ভাঙে। রেল-লাইনের ধারে ওদের আসল ঠেক। সেখানে রাতে ওরা নেশা-ভাং-এ চুর হয়ে হইহুল্লোড় করে।

রাহুল আপনমনেই বলল, 'আমিই ভুল করলাম। কেন যে প্রোটেস্ট করতে গেলাম!'

দীপায়ন বলল, 'তুই লাথিটা খাওয়ার পর চেপে গেলেও হত।'

'আমি তো চেপেই গেছিলাম। এই যে কোকোটা!' কোকোর দিকে আঙুল দেখিয়ে রাহুল কপট রাগের গলায় বলল, 'কোকোটাই তো নেনের সঙ্গে ঝামেলা করল!'

কোকো নির্বিকার সুরে বলল, 'ছেলেটা তোমাকে...মারতে যাচ্ছিল...।'

দীপায়ন বলল, 'হ্যাঁ—তা যাচ্ছিল। কিন্তু....।'

দীপায়নের কথা শেষ হওয়ার আগেই কোকো বলে উঠল, 'রাহুলকে যে...মারবে তাকে আমি...ছাড়ব না। কিছুতেই ছাড়ব না।'

বিকেলের শেষ আলো এসে পড়েছিল কোকোর মুখে। ও এক অদ্ভুত মমতা মাখা সরল চোখে রাহুলের দিকে তাকিয়ে ছিল। একটা আন্তরিক টান টের পেল রাহুল। এই বোকা-হাবা ভোলাভালা ছেলেটা মাত্র দু-সপ্তাহে বিচিত্র এক আত্মীয়তার অদৃশ্য সুতোয় রাহুলদের কখন যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে।

রাহুলের মনে হচ্ছিল, ঢলে পড়া সূর্যের আলো পড়ে নয়—কোকোর মুখটা এমনিই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

।।পাঁচ।।

দু-সপ্তাহে কোকোর কথা গ্রামের যে-ক'জন জেনেছিল, মাকুদের সঙ্গে মোকাবিলার পর সেই সংখ্যাটা প্রায় পঞ্চাশ গুণ হয়ে গেল।

যে-বাচ্চা মেয়েটা মাকুর বাইকের তলায় আর-একটু হলেই চাপা পড়ছিল, তার বাবা-মা ঘটনার পরদিন সন্ধেবেলা রাহুলদের বাড়িতে এলেন—সঙ্গে মেয়েটি। ওঁদের খুব সাধ জেগেছে রাহুল আর কোকোকে স্বচক্ষে একবার দেখেন। ঘোর কলিযুগে এখনও এমন লোক আছে যারা অচেনা-অজানা কাউকে বাঁচানোর তাগিদে প্রতিবাদ করে, ঝুঁকি নেয়!

ওঁদের সঙ্গে গল্প করে কোকো দারুণ খুশি। ওর কথাবার্তা শুনে রাহুল অবাক হল। ওর মনে হল, কোকো যেন প্রথমদিককার তুলনায় কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

প্রতিদিন বিকেলে ফুটবল খেলতে-খেলতে কোকো রাহুলদের ক্লাবে নিয়মিত ফুটবল প্লেয়ার হয়ে উঠল। শুধু রাহুলরা ওকে অনেক করে অনুরোধ করেছে ও যেন জোরে শট না মারে। কারণ, রোজ-রোজ ফুটবল ফেটে গেলে ফুটবল কেনার পয়সা জোগাবে কে!

মাকুদের সঙ্গে এনকাউন্টারের ব্যাপারটা রাহুল ইচ্ছে করেই মাম কিংবা বাপিকে প্রথমে বলেনি। ভুল একটা যখন হয়ে গেছে তখন শুধু-শুধু ওঁদের টেনশান বাড়িয়ে লাভ কী! কিন্তু বাপি পরদিন সকালে খবরটা পেয়ে গিয়েছিলেন। ফলে সেদিন রাতে রাহুলকে মাম আর বাপির জেরার মুখে পড়তে হল।

রাহুল লুকোচুরি না করে সব কথা খুলে বলল।

শুনে বাপি ওকে বললেন, খুব সাবধানে চলাফেরা করতে। সব-সময় কেউ না কেউ যেন সঙ্গে থাকে—একা-একা রাহুল যেন কোথাও না যায়—বিশেষ করে রেললাইনের দিকে।

কোকো একবার বলে উঠল, 'আমি তো রাহুলের সঙ্গে সবসময় থাকি...।'

বাপি আর মাম স্নেহভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। মাম বললেন, 'তোমারও তো বিপদের ভয়, কোকো। রাহুল স্কুলে যাওয়ার সময় আর ফেরার সময় আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকব। আর খেলার মাঠ থেকে ফেরার সময়—' রাহুলের দিকে তাকালেন মাম 'দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে নিবি। বলবি একটু বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে।'

কোকো কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাহুল হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিল।

এই নিয়মেই কয়েকদিন চলল। মাকু বা ওর দলের ছেলেদের সঙ্গে রাহুলদের দেখা হয়, কিন্তু ওরা কিছু বলে না। সাইকেল, বাইক নিয়ে রাহুলদের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তবে আড়চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে।

রাহুলের মনে হয়, কোকোর সুখ্যাতির জন্যই মাকুর দলবল 'বদলা' নেওয়ার ব্যাপারে পিছিয়ে পড়ছে।

কোকোর কথা এখন মণিমেলার প্রায় সবাই জানে। তা ছাড়া মাকুদের কাজকর্ম কেউই পছন্দ করে না। ওদের ওপর সবাই বিরক্ত। সুতরাং এরকম পরিস্থিতিতে যদি কোকো বা রাহুলের গায়ে হাত পড়ে তা হলে মাকুদের বিপদ হতে পারে।

এসব কথা ভেবেই মাকু অপেক্ষা করছিল। আর একইসঙ্গে সুযোগ খুঁজছিল।

রাহুল কোকোর জন্য দুশ্চিন্তা করলেও কোকো একেবারে চিন্তা-ভাবনাহীন। ও ওর মতোই দিন কাটাতে লাগল। টিউবওয়েল পাম্প করে জল তোলা, বাগানে পাখি কিংবা প্রজাপতির পিছনে ছুটোছুটি, ব্যায়াম করা, রাহুলের স্কুলে যাওয়া-আসা, কখনও-কখনও বাপির সঙ্গে বাজারে যাওয়া, বিকেলে মাঠে গিয়ে খেলা, আর বাপির সময় হলেই বাপির কাছে বসে ছবি আঁকা শেখা।

কোকোর দিকে তাকিয়ে মাম আর বাপি অবাক হয়ে ভাবেন। ছেলেটা কেমন শিশুর মতো নিশ্চিন্ত আরামে রয়েছে! ওকে দেখে মাঝে-মাঝে মনে হয়, ও যেন প্রকৃতিরই একটা অংশ।

রাহুলরা বহুদিন ধরেই ভাবছিল ওদের ক্লাব থেকে একটা লাইব্রেরি

তৈরি করবে। এবার ওরা একটা ঘরের সন্ধান পেয়েছে। মণিমেলার সবচেয়ে পুরোনো ডাক্তার ডক্টর পরমেশ হালদার ওঁর দোতলা বাড়ির একতলার একটা ঘর রাহুলদের ছেড়ে দিয়েছেন। সেখানে ওদের লাইব্রেরি হবে—'মণিমেলা সাধারণ পাঠাগার'।

ঘর হাতে পাওয়ার পর রাহুলরা চাঁদা তুলতে শুরু করেছে। তারপর সেই টাকায় ঘর সারানোর কাজেও হাত দিয়েছে। একইসঙ্গে রাহুলরা রবিবার বা ছুটির দিনে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে গল্পের বইয়ের খোঁজ করছে। বলছে, 'আমাদের লাইব্রেরিতে গল্পের বই ডোনেট করুন।'

ওদের উদ্যোগে বহু মানুষ সাড়া দিয়েছে। চাঁদার পাশাপাশি বইও পাওয়া যাচ্ছে অনেক।

এসব কাজে রাহুলদের সঙ্গে কোকোও টোটো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডোনেশানে পাওয়া বইয়ে থলে ভরতি করে দু-হাতে দুটো থলে ঝুলিয়ে ও রাহুলদের সঙ্গে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি অক্লান্তভাবে হেঁটে চলেছে।

এরকমই এক রবিবার। বেলা প্রায় একটা বাজে। মাথার ওপরে গনগনে সূর্য। চারপাশে গরম বাতাস বইছে। রাহুলরা দল বেঁধে বাড়ি-বাড়ি ঘুরছে। ওদের দলে রাহুল, নিধু, গোপাল আর কোকো ছাড়া ছিল ওদের ক্লাবের সেক্রেটারি ঝন্টুদা। ঝন্টুদা ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। চাকরি করে।

একসময় ক্লান্ত হয়ে ওরা ক্ষান্ত হল। একটা বটগাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে দাঁড়াল। কোকো হাতের ভারী থলে দুটো নামিয়ে রাখল মাটিতে।

বটগাছের লাগোয়া একটা বড়-সড় পানের দোকান। দোকানের বাইরে থরে-থরে সাজানো কোল্ড ড্রিঙ্কের পেটি।

ঝন্টুদা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে বলল, 'অ্যাই, তোরা সবাই একটা করে পেপসি খা। আমি খাওয়াচ্ছি।'

রাহুলরা সবাই মিলে 'ঝন্টুদা, জিন্দাবাদ' বলে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর দোকানদারের কাছ থেকে পাঁচটা ঠান্ডা পেপসি নিল। একটা বোতলে স্ট্র ঢুকিয়ে কোকোর হাতে দিল রাহুল 'নাও, পেপসি খাও—।'

কোকো বোতলটা নিয়ে অনভ্যস্ত ঢঙে সিপ করতে শুরু করল।

সবার আগে কোকোর পেপসি খাওয়া শেষ হল। পরপর দুটো ঢেঁকুর তুলল ও।

রাহুলের কোল্ড ড্রিঙ্ক খাওয়া শেষ হলে কোকো বলল, 'রাহুল...পেপসি... খেতে খুব ভালো। মিষ্টি। ভালো।'

ঝন্টুদা ওকে জিগ্যেস করল, 'তুমি আর-একটা খাবে?'

কোকো মাথা হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ...খাব।'

আর-একটা পেপসির বোতল নিয়ে কোকোর হাতে দিল রাহুল। কোকো পরম উৎসাহে স্ট্র মুখে চেপে ধরে পেপসি খাওয়ায় মন দিল। আর রাহুলরা লাইব্রেরির নানান পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

এমন সময় মাকুর বাইক দেখা গেল। ভটভট আওয়াজ তুলে ধুলো উড়িয়ে আসছে।

রাহুলদের কাছে এসে বাইকটা থামাল মাকু। ওর পিছনে বসে আছে নেনে। মাকুর গায়ে টি-শার্ট আর জিন্‌সের প্যান্ট। আর নেনে একটা হলুদ শার্ট আর কালচে প্যান্ট পরে আছে।

মাকু বাইকের স্টার্ট বন্ধ করেনি। বরং মাঝে-মাঝে হাতল ঘুরিয়ে ইঞ্জিন রেস করছে।

নেনের আঙুলে সিগারেট ধরা ছিল। ঝন্টুদাকে দেখে ও উদ্ধত রুক্ষ ভঙ্গিতে সিগারেটে টান দিতে লাগল। ঝন্টুদা অস্বস্তিতে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

নেনে বাইক থেকে নেমে পড়ল। চোখ সরু করে সিগারেটে টান মারতে-মারতে এগিয়ে এল রাহুলদের দিকে—অথবা পানের দোকানের দিকে।

রাহুল চট করে তাকাল কোকোর দিকে। ওর বুক কেঁপে উঠল। যদি আগের দিনের মতো কিছু একটা হয়! রাহুলের ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি নেনে ওর বুকের ভেতরে হওয়া ধড়াস-ধড়াস শব্দ শুনতে পাবে।

ঝন্টুদা, নিধু, গোপাল পানের দোকানের সামনে থেকে পায়ে-পায়ে সরে যেতে লাগল। রাহুলও সেই চেষ্টাই করল। নেনের নজর এড়িয়ে কোকোর জামা ধরে চোরা টান মারল। কিন্তু কোকো সেটা টের পেলে তো! ও তখন পেপসি খেতে মশগুল। স্ট্র-এর টানে বোতলের তরলে চড়বড়-চড়বড় শব্দ হচ্ছে।

নেনে ঝন্টুদার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর বাঁ-হাতে সিগারেট, ডানহাতটা পকেটে গোঁজা।

ঝন্টুদার মুখে পরপর দুবার ধোঁয়া ছুড়ে দিল নেনে। ঝন্টুদা মুখে কিছু বলল না—শুধু নাক টিপে এক ঝটকায় মুখটা পাশে ফেরাল।

'কী, সেক্রেটারিবাবু! শুনলাম, ডাক্তার হালদারের একতলার ঘরটা তোমরা লপ্‌কে নিয়েছ—লাইব্রেরি না কীসব করবে!'

মুখটা ঘুরিয়ে রেখেই চাপা গলায় ঝন্টুদা জবাব দিল, 'আমাদের গ্রামে একটা লাইব্রেরি হওয়া খুব দরকার। অনেকদিন ধরে সবাই বলছে... তাই ডক্টর হালদারের কাছে আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম। লাইব্রেরিটার নাম হবে "মণিমেলা সাধারণ পাঠাগার"। ডক্টর হালদার বলেছেন...।'

'ওসব ঢপের কেত্তন ছাড়ো!' নেনে খিঁচিয়ে উঠল, 'পাঠাগার হবে না কাঁচকলা হবে। ও-ঘরটা আমরা টার্গেট করেছিলাম...ক্লাবঘর করব। তো বুড়োটাকে তোমরা টুপি দিয়ে ঘরটা হড়কে নিলে?'

নিধু ভয় পেলেও মিনমিন করে পাশ থেকে বলল, 'সত্যি বলছি—লাইব্রেরি হবে। এই তো—' গাছতলায় রাখা বইভরতি থলে দুটো দেখাল 'আমরা সবার কাছ থেকে চেয়ে-চেয়ে গল্পের বই জোগাড় করছি...।'

নেনে সিগারেট ফেলে দিয়ে বাঁ-হাতে খপ করে নিধুর কলার চেপে ধরল 'তুই কি সালা ঝন্টুর উকিল না কি?'

মাকু বাইকে গরগর আওয়াজ তুলে এগিয়ে এল নেনের কাছে। বাইক থামাল।

নেনের কথায় রাহুলের গা জ্বালা করছিল। কিন্তু মাকুদের সঙ্গে ওদের লড়ার ক্ষমতা কতটুকু! তা ছাড়া মাম আর বাপি বলেছেন, এসব ঝামেলা এড়িয়ে থাকতে।

রাহুল মারপিটকে ভয় পায়। তাই ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। নেনেরা বোধহয় এক্ষুনি গায়ে পড়ে একটা গন্ডগোল তৈরি করবে।

ও কোকোর দিকে তাকাল। নির্বিকারভাবে পেপসি খেয়ে চলেছে।

নিধুকে কলার ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল নেনে। আর মাকু দাঁত বের করে হাসছিল।

রাহুল ভয় পেলেও প্রতিবাদ না করে থাকতে পারল না।

'নিধুকে ছেড়ে দাও!' ও চেঁচিয়ে বলল।

সঙ্গে-সঙ্গে নিধুকে ছেড়ে দিল নেনে। এবং রাহুলের দিকে ঘুরল। কিন্তু রাহুলের দিকে এক পা এগিয়েই থেমে গেল ও। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কোকোর দিকে। ও তখন পেপসি খাওয়া শেষ করে খালি বোতলটা দোকানির হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

'এই তোত্‌লা কাত্তিক!' বাজেভাবে হাত নেড়ে কোকোকে কাছে ডাকল নেনে। তারপর রাহুলকে লক্ষ করে বলল, 'তোর গায়ে হাত তুললেই তো আবার ওই ক্যালানে কাত্তিক রুখতে আসবে। এলে আজ ওকে মজা দেখাব। সেদিন কিছু বলিনি...।'

কোকো নেনের কাছে এগিয়ে আসছিল। তাই দেখে রাহুল আর থাকতে পারল না। ও নেনের হাত চেপে ধরে অনুনয় করে বলল, 'ওকে কিছু বোলো না। ওর অসুখ আছে...।'

'সব অসুখ আজ ঝেড়ে সারিয়ে দেব।' ঠোঁট বেঁকিয়ে কথাটা বলে এক ঝটকায় রাহুলের হাত ছাড়িয়ে নিল। শব্দ করে হেসে উঠল 'সেদিন মওকা পেয়ে আমাকে হেভি বেইজ্জত করেছিস...।'

মাকু বাইকে বসা অবস্থাতেই চেঁচিয়ে বলল, 'মালকে একটু বাইক দিয়ে চেটে দেব নাকি?'

ঝন্টুদা নেনের কাছে এগিয়ে এল 'এসব কী হচ্ছে? কেন পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করছ, ভাই? তোমাদের ক্লাবঘরের জন্যে অন্য আর-একটা ঘর...।'

ঝন্টুদার মুখে থুতু ছুড়ে দিল নেনে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ধমকে উঠল, 'ফোট সালা! কাঁঠালের আঠা মারতে এসেছে! এখুনি বডি নামিয়ে দেব। ফোট!'

ঝন্টুদার মুখ-চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। ঘৃণার চোখে নেনেকে দেখল। তারপর এক-পা পিছিয়ে এল।

কোকোকে আদুরে গলায় কাছে ডাকল নেনে। ডানহাতটা পকেট থেকে বের করে নিল।

সঙ্গে-সঙ্গে রাহুল ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

নেনের হাতে প্রায় ছ'ইঞ্চি ফলার একটা চকচকে ছুরি। বাতাসে ফলাটা ধরে সাপের ফণার মতো নাচাচ্ছে।

ছুরিটা দেখামাত্রই কোকো কেমন যেন হয়ে গেল। কাতর চোখে নেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার... সঙ্গে...আমি মারপিট করব না...।'

'কেন রে, তোতলা কাত্তিক? লড়বি না কেন?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল কোকো 'আমি...আর কাউকে...মারব না। কাউকে...কষ্ট দেব না। আমি...আর মারপিট...করব না। কাউকে... কষ্ট...দেব না।'

এ-কথায় মাকু আর নেনে হো-হো করে হেসে উঠল।

রাহুল বিপন্ন মরিয়া চোখে চারপাশে তাকাচ্ছিল। যদি কারও কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুপুরে পথে তেমন লোকজন নেই। আর যে-দু-একজন পথচারী চোখে পড়ছে তারা মাকুর মার্কামারা মোটরবাইক দেখেই সটকে পড়ছে। সেইসঙ্গে রাহুল এটাও লক্ষ করল যে, পানের দোকানের দোকানদার তার বসার জায়গা ছেড়ে মেঝেতে নেমে পড়েছে। ধীরে-ধীরে পা বাড়াচ্ছে দোকানের খিড়কি-দরজার দিকে। এই জায়গাটাকে সে আর নিরাপদ মনে করছে না।

নেনে কোকোর দিকে আরও এক-পা এগিয়ে যেতেই কোকো দু-পা পিছিয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠল 'আমি আর কাউকে...মারব না। কাউকে কষ্ট দেব না। মাস্টারজিকে আমি বলেছি। মারপিট করতে আমার ভালো লাগে না। আমি...বাড়ি...যাব।'

অন্য সবার কাছে কোকোর কথাগুলো পাগলের প্রলাপ মনে হচ্ছিল। কিন্তু রাহুল যেন কিছু-কিছু বুঝতে পারছিল।

কোকো পিছোতে-পিছোতে একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা খেল। তারপর চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে গাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

মাকু আর নেনে এই পাগলামি দেখে আবার হেসে উঠল। আর রাহুলরা কোকোর কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে গেল।

যে-ছেলেটার গায়ে এত শক্তি সে কি না এরকম ভয় পেয়ে গেছে!

রাহুল আন্দাজ করল, কোকোর ভয়টা আসলে নেনের হাতের ছুরিটার জন্য। এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

কোকো তখন গাছের একটা ডালে বসে আপনমনে বলে চলেছে, 'আমি আর লড়ব না। কাউকে মারব না। কষ্ট দেব...না। মারব...না।'

নেনে হাতের ছুরিটা শূন্যে নাচিয়ে কোকোকে দু-চারবার নকল ভয়

দেখাল। যেন এই ও কোকোর গায়ে ছুরি বসাল বলে। কোকো সেই ভয় দেখানোর তালে-তালে সিঁটিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। সেটা দেখে নেনে আর ওর দাদা বেশ মজা পাচ্ছিল।

রাহুল কোকোর হেনস্থা আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠল, 'ওকে শুধু-শুধু ভয় দেখাচ্ছ কেন? ছেড়ে দাও—।'

সঙ্গে-সঙ্গে নেনের হাসিটা বদলে গেল হিংস্র কুটিল মানচিত্রে। ও চট করে চলে এল রাহুলের কাছে। ছুরির ডগাটা ছুঁইয়ে দিল ওর গলায়। নোংরা গালাগাল দিয়ে বলল, 'একদম চুপ। নইলে...।'

নইলে কী হবে সেটা আর নেনের বলা হল না।

কারণ, চোখের পলকে গাছ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়েছে কোকো। একটা ডিগবাজি খেয়ে শরীরটা গড়িয়ে নিয়ে এসেছে নেনের কাছে। দু-হাতে ওর দুটো পা ধরে প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান মেরেছে।

নেনে উপুড় হয়ে উলটে পড়ল মাটিতে। কোকো একলাফে চড়ে বসল ওর শরীরের ওপরে। ছুরি-ধরা হাতটাকে মোচড় দিয়ে চেপে ধরল পিঠের দিকে। তারপর জোরে একটা ঝটকা দিল। ছুরি খসে পড়ল নেনের মুঠো থেকে। ও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

কোকো চিৎকার করে বলল, 'রাহুলকে...মারবে না। যে মারবে তাকে আমি...মেরে ফেলব।'

কথা শেষ করেই নেনের চুলের মুঠি খামচে ধরল ও। মাথাটা টেনে শূন্যে তুলল। তারপর ভয়ংকর জোরে ঠুকে দিল মাটিতে।

নেনে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। মাকু বাইকে বসে হতবুদ্ধি হয়ে ভাইয়ের করুণ অবস্থা দেখতে লাগল।

'রাহুলকে মারবে না। রাহুলকে...' নেনের দিকে আগুন-ঝরা চোখে তাকিয়ে ছিল কোকো। নেনের চুলের মুঠিটা ওর হাতে ধরা ছিল। সেই অবস্থাতেই বিড়বিড় করে কথাগুলো বলছিল।

রাহুল ছুটে গিয়ে কোকোর হাত চেপে ধরল 'কোকো! কোকো! কী করছ! ছাড়ো—ও যে মরে যাবে!'

রাহুলের দেখাদেখি ঝন্টুদা, নিধু, গোপাল ওরাও কোকোর কাছে ছুটে এসেছিল। কোকোকে থামাতে চেষ্টা করছিল, ওকে হাত ধরে টেনে সরানোর চেষ্টা করছিল।

অনেক কষ্টে কোকোকে শান্ত করা গেল। নেনেকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। তারপর রাহুলের একটা হাত চেপে ধরল। ভাবটা এমন যেন এই হাতটা ও আর ছাড়বে না।

রাহুল ওকে নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল।

কোকো হাঁপাচ্ছিল। নেনের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঝন্টুদারা তখন নেনেকে ধরে তুলে দাঁড় করাচ্ছে।

নেনে বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল। ওর কপালে রক্ত। কোকোর দিকে ও এমনভাবে চেয়ে আছে যেন অন্য গ্রহের প্রাণী দেখছে।

ঝন্টুদা পকেট থেকে রুমাল বের করে নেনের কপালের রক্ত মুছে দিল। বলল, 'ফেরার পথে একটু ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ো—।'

নেনে কোনও জবাব দিল না।

ঝন্টুদারা নেনের জামাকাপড় হাত দিয়ে ঝেড়েঝুরে ওকে মাকুর বাইকের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল।

মাকু বাইক থেকে নামেনি। আগের দিনের মতো ও আর তর্জন-গর্জন করছিল না। নেনেও একেবারে চুপ। ভালো করে কারও দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত।

ঝন্টুদা মাকুকে বলল, 'মাকু, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। কোকো তো অত বোঝে না। আসলে রাহুলকে ও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। রাহুলকে কেউ কিছু করলে ও কেমন পাগলের মতো হয়ে যায়। যাকগে, তুমি ব্যাপারটা ভুলে যাও। আর একটা কথা এটা নিয়ে থানা-পুলিশ কোরো না। আমরাও ব্যাপারটা আর মনে রাখব না।'

মাকু ছোট্ট করে ঘাড় নাড়ল।

ঝন্টুদা আর নিধু নেনেকে ধরে বাইকে বসাল। ঝন্টুদা মাকুর পিঠে হাত দিয়ে বলল, 'তোমরা তো ক্লাব-ঘর করবে। আমি দেখছি—সুটেব্‌ল কোনও ঘর পাওয়া যায় কি না। আর শোনো...' মাকু তাকাল ঝন্টুদার দিকে। ঝন্টুদা বলল, 'আমরা তোমার শত্রু নই। প্লিজ, আজকের ব্যাপারটা ভুলে যেয়ো।'

মাকু আর নেনে চলে গেল। ওদের ছুটন্ত বাইকের পিছনে ধুলোর মেঘ তৈরি হল।

ঝন্টুদা, নিধু, গোপাল নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা

করতে লাগল। আর রাহুল কোকোর হাত ধরা অবস্থায় ভাবছিল ওর অদ্ভুত আচরণের কথা। এই বলছে, 'আমি আর লড়ব না। কাউকে মারব না। কষ্ট দেব...না। মারব...না।' আবার পরক্ষণেই রাহুলকে 'রক্ষা' করতে সে পেশাদার যোদ্ধার তৎপরতায় শত্রুকে ঘায়েল করছে!

কোকোর লড়াই দেখে রাহুলের মনে হচ্ছিল শুধু সিনেমায় এরকম লড়াই দেখা যায়। তা ছাড়া বহুদিন প্র্যাকটিস না করলে কারও পক্ষে এরকম দক্ষতায় পৌঁছনো সম্ভব নয়।

বাড়ি ফেরার পথে রাহুল কোকোকে জিগ্যেস করল, 'কোকো, এরকম ফাইটিং তুমি কোথায় শিখলে?'

'শিখেছি ভগবতীপ্রসাদের কাছে।'

'কে ভগবতীপ্রসাদ?'

'আমার ট্রেনার। আট বছর...আমি ট্রেনিং নিয়েছি। তারপর...।' হঠাৎ চুপ করে গেল কোকো। ওকে দেখে রাহুলের মনে হল, ও কী যেন ভাবছে। বোধহয় কোনও কিছু মনে করার চেষ্টা করছে।

'আট বছর ট্রেনিং নেওয়ার পর কী করেছ? তারপর কী?'

কোকো রাহুলের দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'তারপর অনেক ফাইট করেছি। অনেক লড়াই...করেছি। অনেক জিতেছি। অনেক ফাইট করেছি...।'

রাহুল অবাক হয়ে কোকোর দিকে তাকিয়ে রইল।

।। ছয় ।।

কয়েকদিন পর এক অদ্ভুত ঘটনায় মাঝরাতে রাহুলের ঘুম ভেঙে গেল।

ও অদ্ভুত সব শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। যন্ত্রণার শব্দ—তার সঙ্গে কথা।

'ওঃ! ওঃ! মাস্টারজি! ছেড়ে দাও! আমি...আর...করব না। আমাকে...ছেড়ে দাও। ওঃ...।'

দু-হাতে চোখ ডলে অন্ধকার মেঝের দিকে তাকাল রাহুল। চাপা কর্কশ গলায় টুকরো কথাগুলো কে বলছে ও ভালোই বুঝতে পারল। কিন্তু ও অন্ধকারে কোকোর শরীরটা ভালো করে ঠাহর করতে পারছিল না।

লাল আর সবুজ রঙের আলোর ঝিলিক চোখে পড়ল রাহুলের। ছোট-ছোট রঙিন আলোর বিন্দু জোনাকির মতো জ্বলছে-নিভছে।

রাহুলের ঘুম ছুটে গেল। ভালো করে চোখ রগড়ে বিছানায় উঠে বসল ও। চাপা গলায় ডাকল, 'কোকো! কোকো! কী হয়েছে?'

কোকোর কাছ থেকে কোনও উত্তর এল না। ওর যন্ত্রণার আর্তনাদ আর টুকরো কথা চলতেই লাগল।

রাহুল এবার বিছানা থেকে নেমে পড়ল। বহুদিনের অভ্যাসে ওর ডানহাত সহজেই পৌঁছে গেল আলোর সুইচের কাছে। আলো জ্বালতেই কোকোকে দেখতে পেল ও।

কোকোর দু-চোখ বোজা। শরীরটা মেঝের বিছানা থেকে গড়িয়ে চলে এসেছে বাইরে। গলার কন্ট্রোল ব্যান্ডটা দু-হাতে আঁকড়ে ধরে ও ছটফট করছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে। কন্ট্রোল ব্যান্ডের গায়ে লাল আর সবুজ আলো দপদপ করে জ্বলছে। ইলেকট্রনিক খেলনায় যেমন ছোট-ছোট রঙিন বাতি থাকে সেইরকম।

রাহুল ছুটে গেল কোকোর কাছে। ঝুঁকে পড়ে ওকে জোরে ধাক্কা দিল 'কোকো! কোকো!'

কয়েকবার ধাক্কা দিতেই কোকো চোখ খুলল। ওর ছটফটানি থেমে গেল। রাহুল দেখল, ও কুলকুল করে ঘামছে।

কোকো উঠে বসল। বড়-বড় শ্বাস ফেলছে। চোখে-মুখে ভয়। কন্ট্রোল ব্যান্ডটা এখনও দু-হাতে আঁকড়ে ধরে আছে। ওটার লাল-সবুজ বাতি এখন নিভে গেছে।

রাহুল বসে পড়ল ওর পাশে।

'কী হয়েছে, কোকো? কী হয়েছে?' ওর ঘামে ভেজা গালে হাত বোলাতে-বোলাতে রাহুল বলল, 'কোনও বাজে স্বপ্ন দেখেছ?'

কোকো ভয়ার্ত চোখে রাহুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাস্টারজি... আসছে। কাছে...এসে গেছে।'

'তোমার গলার ওই ব্যান্ডটাতে আলো জ্বলছিল। লাল...সবুজ...।'

কোকো ব্যান্ডটা ছেড়ে দিল। হাত দিয়ে মুখ মুছল। চাপা গলায় বলল, 'মাস্টারজি...কাছে এসে গেলে ওরকম...আলো জ্বলে। আর...মাথায় খুব যন্ত্রণা হয়...।'

কোকোর অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রাহুল। এই শিশু-যুবকের আতঙ্ক আর কষ্ট দেখে ওর মায়া হচ্ছিল। 'মাস্টারজি...আসছে। কাছে... এসে গেছে।' এর মানে কী? মাস্টারজি কাছে এসে গেলে ওই লাল-সবুজ আলোগুলো জ্বলে, কোকোর মাথায় যন্ত্রণা হয়?

ভেবে-ভেবে কোনও থই পাচ্ছিল না রাহুল। ও উঠে গিয়ে জলের বোতল নিয়ে এল। ছিপি খুলে বোতলটা এগিয়ে দিল কোকোর হাতে 'নাও—জল খাও।'

ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল কোকো। তখনও ও অল্প-অল্প হাঁপাচ্ছে। বোধহয় মাস্টারজির আতঙ্কের রেশ এখনও কাটেনি।

বেশ কিছুক্ষণ পর কোকো শান্ত-স্বাভাবিক হল। তখন রাহুল আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

কোকো আপনমনে ছবি আঁকছিল। রাহুল ওর পাশে বসে ছবি আঁকা দেখছিল।

যে-ছবিটা কোকো আঁকতে চেষ্টা করছিল সেটা রাহুলদের স্কুল। যদিও ছবিটা দেখে সেটা বোঝা খুব শক্ত। তবে রাহুল যে স্কুলটাকে একটু-একটু চিনতে পারছিল তার কারণ, ওদের স্কুল বিল্ডিং-এর পাশে চারটে

বড়-বড় গাছ আছে। আর তার পাশ ঘেঁষেই একটা বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং। কোকোর ছবিতে—বিমূর্ত এবং বিকৃত চেহারায় হলেও—সেগুলো আঁকা আছে। যদি তারপরেও কারও বুঝতে অসুবিধে হয় সেইজন্য ছবির মাথায় আঁকাবাঁকা হরফে লেখা আছে 'রাহুলের ইশকুল।'

রাহুলের আজ স্কুল ছুটি। স্কুলের ফাউন্ডেশান ডে। তাই দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ও কোকোর সঙ্গে গল্প করতে বসেছে। ওর ইচ্ছে, কোকোর মাস্টারজি সম্পর্কে আরও কিছু খবর জেনে নেয়।

কিছুক্ষণ এটা-সেটা নিয়ে কথা বলার পর কোকো ছবি আঁকার বায়না ধরল। তখন রাহুল ওকে জল রং আর কাগজ দিয়ে ছবি আঁকতে বসিয়েছে। আর ছবি আঁকা নিয়ে টুকটাক কথা বলার ফাঁকে মাস্টারজি সম্পর্কে দু-চারটে প্রশ্ন করেছে। কোকো ওর খেয়াল মতো কখনও প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, কখনও দিচ্ছে না। ও মেঝেতে 'বাবু' হয়ে বসে ঘাড় গুঁজে একমনে কাগজের ওপরে রং বুলিয়ে চলেছে।

রাহুল ওর আঁকা ছবিটা দেখছিল। কোকোর আঁকা দেখে বোঝা অসম্ভব যে, ওর মা ভালো ছবি আঁকত।

রাহুল বলল, 'কোকো, লাল রংটায় আর-একটু জল মেশাও—হালকা করে নাও। মাস্টারজি কোথায় থাকে?'

'অনেক দূরে। এখন...কাছে...এসে গেছে। এইখানটায় সবুজ রং দিই?'

রাহুল ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল। ওর মনে পড়ল, শুরু থেকে কোকো সবসময় বলে এসেছে মাস্টারজি দূরে থাকে। কিন্তু ইদানিং ও বলছে, মাস্টারজি কাছে এসে গেছে। সেই কাছে এসে যাওয়াটা কি কোকোর গলার কন্ট্রোল ব্যান্ডে ধরা পড়েছে?

'না, না—নীল রং দিয়ো না। তুমি তো জানো গাছের পাতা সবুজ হয়।'

কোকো ছবি থেকে মুখ তুলে তাকাল রাহুলের দিকে। হেসে বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ। গাছের...পাতা...সবুজ হয়। সবুজ...।'

'মাস্টারজির কাছে আর কে-কে আছে, কোকো?'

'আকাশ তো নীল। তাই...না, রাহুল?'

'হ্যাঁ, নীল। আর কে-কে আছে মাস্টারজির কাছে?' রাহুল আবার জানতে চাইল।

'আকাশ নীল। আকাশ...নীল। রাহুল বলেছে।' আপনমনেই খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'সুলতানদা আছে। রামুদা...আছে। ময়না...আছে।'

অবাক হল রাহুল। সুলতানদা, রামুদা, ময়না—এরা কারা?

বারবার প্রশ্ন করেও কোকোর কাছ থেকে আর কোনও সূত্র পাওয়া গেল না।

'এটা তো গাছের গুঁড়ি। এটা ব্রাউন রং দাও। বাদামি।'

কোকো গাছের গুঁড়িতে সবুজ রং দিতে যাচ্ছিল। রাহুলের কথায় ও নতুন উৎসাহে বাদামি রং গুলতে শুরু করল।

'এই গাছের গুঁড়িটাও বাদামি রং হবে।' ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল রাহুল, 'আচ্ছা কোকো, মাস্টারজি তো বলছ কাছে এসে গেছে। যদি তোমার একেবারে সামনে এসে পড়ে তা হলে কী হবে?'

ছবি আঁকা থামিয়ে দিল কোকো। চোখ বড়-বড় করে তাকাল রাহুলের দিকে 'আমার...তখন...খুব ভয় করবে।' বাঁ-হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিল ও। রাহুলের দুটো আঙুল চেপে ধরে আস্তে-আস্তে বলল, 'কিন্তু...রাহুলকে ছেড়ে...আমি যাব না। মাস্টারজি ভয় দেখালেও...না। যাব না।'

রাহুল কোকোর মুঠোর মধ্যে অদ্ভুত এক উষ্ণতা খুঁজে পেল। ও আঙুল দুটো ছাড়িয়ে নিল না। কোকোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর রাহুলের হাত ছেড়ে দিল ও। আবার ছবি আঁকায় মন দিল।

গত একসপ্তাহে চারবার কোকোর কন্ট্রোল ব্যান্ডের লাল-সবুজ এল. ই. ডি. বাতি জ্বলে উঠেছে। আর একইসঙ্গে কোনও এক রহস্যময় যন্ত্রণায় কোকো ছটফটিয়ে উঠেছে। রাহুল ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। কেনই বা আলো জ্বলছে, আর কেনই বা কোকো ছটফট করে উঠছে? মাস্টারজির সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্কই বা কী?

কোকো যে ধীরে-ধীরে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সেটা রাহুল বেশ বুঝতে পারছিল। ঘিয়া নদীর পাড়ে কোকোকে প্রথম যখন রাহুল দেখেছিল তখন ওকে দিগভ্রান্ত, জড়বুদ্ধি, মানসিক রোগী বলে মনে হয়েছিল। এখন ও কত পালটে গেছে! সবসময় হাসিখুশি। হাসিমুখে কত না পরিশ্রমের কাজ করে ও! ওর গায়ের জোর গ্রামে একরকম

কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের সবাই কোকোকে ভালোবাসে। ঝন্টুদা দেখা হলেই কোকোকে আইসক্রিম কিংবা পেপ্‌সি খাওয়ায়। ঝন্টুদা লাইব্রেরির কোনও কাজের কথা বললেই কোকো একপায়ে খাড়া। তবে ওকে বুদ্ধির কাজ কেউ দেয় না—দেয় শক্তির কাজ।

কোকো সবসময় রাহুলের পিছন-পিছন ঘোরে। রাহুলকে চোখের আড়াল হতে দেয় না। রাহুল কখনও বারণ করলেও ও শোনে না। রাহুলকে মাকু আর নেনের কথা বলে। বলে, 'আমি সঙ্গে থাকলে...তোমাকে কেউ কিছু করবে না। আমার গায়ে...জোর আছে।'

ওর কথায় রাহুল হাসে।

এর মধ্যে বেশ কয়েকদিন নেনে আর মাকুর সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে। কিন্তু মাকুরা গায়ে পড়ে কোনও কথা বলেনি। চুপচাপ এড়িয়ে গেছে।

কোকোকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে রাহুল একদিন চলে এসেছিল ঘিয়া নদীর পাড়ে।

বর্ষা কবেই এসে গেছে। সেই বর্ষার জলে নদী ফুলে উঠেছে। দুপাশের গাছপালার দল সবুজে-সবুজে মাতোয়ারা।

রাহুল কোকোকে নিয়ে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করল। নদীর ঘোলাটে জল ওদের পাশে-পাশে ছুটছে।

রাহুল বলল, 'কোকো, মনে পড়ে, এই নদীতে তুমি ভেসে এসেছিলে? ওই গাছটার নীচে—' আঙুল তুলে গাছটা দেখাল রাহুল '—তুমি পড়ে ছিলে।'

কোকো নদী বরাবর তাকাল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'মনে...আছে। আমি...সাঁতার...জানি...।'

'আমিও সাঁতার জানি।' বলল রাহুল, 'তুমি কি মাস্টারজির কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলে?'

রাহুলের দিকে তাকাল কোকো। মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

'কেন, পালিয়ে এসেছ কেন?'

কোকো চুপ করে রইল। ওর শূন্য চোখ নদীর জলের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু রাহুল বুঝতে পারল ও নদীর জল দেখছে না—অন্য কিছু ভাবছে।

আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি নেই। কিন্তু শেষ বৃষ্টির জল এখনও মাটি

ভিজিয়ে রেখেছে। গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে কোথায় যেন বুলবুলি আর দোয়েল ডাকছে। নদীর সঙ্গে বয়ে আসা এক অদ্ভুত হাওয়া রাহুলের মনখারাপ করে দিচ্ছিল।

কোকো হঠাৎ নদীর পাড়ে বসে পড়ল। নদীর জলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

রাহুলও বসে পড়ল ওর পাশে। ওর পিঠে হাত রাখল 'কোকো, তুমি পালিয়ে এসেছিলে কেন?'

কোকো আলতো ফিসফিসে গলায় বলল, 'মাস্টারজি...আমাকে...মারত। সিগারেটের...ছ্যাঁকা দিত। তাই নদীতে... ঝাঁপ দিয়ে...পালিয়ে এসেছি।'

'তোমাকে মারত কেন মাস্টারজি?'

'আমি আর লড়তে চাইনি...তাই।' কথাটা বলে কোকো বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগল।

'কার সঙ্গে লড়তে চাওনি?' রাহুলের ভেতরে কৌতূহলের ঘূর্ণিপাক শুরু হয়ে গিয়েছিল।

'কারও সঙ্গে না। আমি বলেছি ...আমি আর...লড়ব না। কাউকে... মারব না। কষ্ট...দেব না।'

রাহুল আবার ওকে জিগ্যেস করল, 'তুমি কার সঙ্গে লড়তে চাওনি?'

কোকো কোনও জবাব দিল না। শুধু রাহুলের হাতটা পিঠ থেকে নামিয়ে জোরে আঁকড়ে ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'আমার মা নেই। বাবা নেই। কেউ...নেই।'

একই কথা বারবার বলতে লাগল কোকো। বলতে-বলতে ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রাহুলের দিকে আর্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, রাহুল।'

রাহুল ছোট বাচ্চাটাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল।

কোকোকে নিয়ে রথের মেলায় গিয়েছিল রাহুল। রেললাইন পেরিয়ে আরও বেশ খানিকটা গেলে একটা বিশাল মাঠ। মাঠটার নাম 'শকুন্তলার মাঠ'। কেন যে এরকম নাম কেউ জানে না। সেই মাঠে প্রতি বছরেই রথের মেলা বসে।

মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ দৈত্যের মতো নাগরদোলা। এ ছাড়া রয়েছে অনেক মণিহারী দোকান, খাবারের স্টল, খেলনাপাতির দোকান, পাঁপড়ভাজা আর তেলেভাজার দোকান। এসবের সঙ্গে এই মেলা উপলক্ষ্যেই থাকে পাখির হাট। নানান ধরনের রঙিন পাখির পসরা সাজিয়ে বসে দোকানিরা। টিয়া, চন্দনা, বদ্রিকা থেকে শুরু করে আরও কতরকম পাখি!

চারপাশে লোকজনের হইচই, হারিয়ে যাওয়া বাচ্চার কান্না, মাইকের হিন্দি গান, সবমিলিয়ে এক অদ্ভুত শব্দব্রহ্ম তৈরি হয়েছিল। তারই মধ্যে কোকো আর রাহুল মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

বাপি আর মামের কাছে বায়না করে রাহুল কোকোকে নিয়ে মেলায় এসেছে। বাপিকে ও বোঝানোর চেষ্টা করেছে কোকো যত স্বাভাবিক জীবনে মিশবে তত তাড়াতাড়ি ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। মেলায় আসার সময় বাপি রাহুলের হাতে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন।

এখন সেই পঞ্চাশ টাকা ভাঙিয়েই ওরা মেলার আনন্দ কুড়োচ্ছিল। নাগরদোলায় চড়া, তেলেভাজা আর পাঁপড়-ভাজা খাওয়া, তার সঙ্গে কোকোর প্রিয় পেপসি—একের পর এক চলছিল।

একটা খেলার দোকানে বল ছুড়ে ন'টা কাঠের পুতুলকে কাত করে দেওয়ার কমপিটিশান হচ্ছিল। তিনবারের চেষ্টায় ন'টা পুতুলকে শুইয়ে দিতে পারলেই পাওয়া যাবে পুরস্কার—মাঝারি মাপের স্টেইনলেস স্টিলের একটা বাটি।

রাহুল পাঁচ টাকা দিয়ে কমপিটিশানে নাম দিল। তিনবার বল ছুড়ে ও সাতটা পুতুলকে কাত করে দিল বটে কিন্তু পুরস্কার জিততে পারল না।

রাহুল বল ছোড়ায় নাম দেওয়ার জন্য কোকোকে বলল। কিন্তু কোকো বারবার মাথা নেড়ে জানাল যে, ওর হাতে একদম টিপ নেই।

এরপর ওরা এয়ারগান শুটিং-এর স্টলে গেল। দেওয়ালে লাগানো নানা রঙের বেলুন। তারই একপাশে বেলুন লাগানো চক্র ঘুরছে, সুতোয় বাঁধা প্লাস্টিকের বাঘ-সিংহ, এমনকি জ্বলন্ত মোমবাতি আর পেরেকও ঝুলছে।

রাহুল পাঁচবার ফায়ার করে দুটো বেলুন ফাটাতে পারল। কিন্তু

কোকো এবারেও রাজি হল না। মাথা নেড়ে বলল, 'আমার...হাতে টিপ নেই।'

মেলায় ঘুরতে-ঘুরতে কখন যেন সন্ধে নেমে এসেছে। চারপাশের খুঁটিতে লাগানো হ্যালোজেন আলো জ্বলে উঠেছে। স্টলে জ্বলে উঠেছে বাল্‌ব আর টিউবলাইট। লোকের ভিড় আরও বাড়ছে। মাইকে মেলার কর্তৃপক্ষ কীসব যেন ঘোষণা করছে।

একটা স্টলের সামনে বহু মানুষের ভিড় দেখে রাহুল দাঁড়িয়ে পড়ল। কোকোকেও হাত ধরে টেনে থামাল।

ভিড় ঠেলে রাহুল আর কোকো কয়েকটা স্তর এগিয়ে গেল। দেখল, স্টলে একটা বিচিত্র কমপিটিশানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্টলের ঠিক মধ্যিখানে একটা পুরোনো টিউবওয়েল পোঁতা আছে। টিউবওয়েলের কলের মুখে একটা নীল রঙের প্লাস্টিকের বালতি বসানো। আর টিউবওয়েলের গায়ে, হাতলে, ফুলের মালা জড়ানো। স্টলের কাপড়ের দেওয়ালে বেশ কয়েকটা পোস্টার আঁটা। পোস্টারে যা লেখা আছে তার সারমর্ম হল এই টিউবওয়েলটা পাম্প করে সহজে জল তোলা যায় না; যদি কেউ দশবার পাম্প করে তার মধ্যে এই কল থেকে জল বের করতে পারে তা হলে পুরস্কার একশো টাকা।

প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়ার এন্ট্রি ফি দশ টাকা।

স্টলের মালিক চিৎকার করে চ্যালেঞ্জারকে আহ্বান জানাচ্ছিল 'আসুন, দেখিয়ে দিন আপনার গায়ে কত জোর! এই বেআদব টিপকলটাকে শায়েস্তা করুন—!'

রাহুল দেখল, গাঁট্টাগোট্টা চেহারার অনেকেই বেশ আশা নিয়ে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে নামছে, কিন্তু হার মেনে ফিরে আসছে। কলের মুখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল বেরোচ্ছে না।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, 'তোমার এই টিপকল থেকে জল আদৌ বেরোয় তো?'

অমনি স্টলের মালিক তার পাশে দাঁড়ানো লোকজনের মধ্যে কাকে যেন ইশারা করল। স্যান্ডো গেঞ্জি পরা স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে কলের সামনে এগিয়ে গেল। মালিকের নির্দেশে জোরালো 'হ্যাঁচকা

দিয়ে টিউবওয়েলটা পাম্প করতে লাগল। আর মালিক চিৎকার করে এক থেকে দশ গুনতে লাগল। তার সঙ্গে-সঙ্গে পাবলিকও হই হই করে গলা মেলাল।

আটবারের বার কলের মুখ থেকে সরু সুতোর মতো জল বেরোল। তারপরের দুবারে জলের ধারাটা লাঠির মতো মোটা হল।

তারপর ছেলেটা থামল। জনতা চিৎকারে ফেটে পড়ল।

রাহুল কোকোকে ঠেলা মারল 'কোকো, নাও—এবার নাম দাও...।'

কোকো কিন্তু মাথা নাড়ল। বলল, 'না, রাহুল—না।'

রাহুল ওকে ছাড়ল না। বলল, 'কেন, "না" কেন? এবারে তো আর টিপের ব্যাপার না—গায়ের জোরের ব্যাপার। তুমি যে বল তোমার গায়ে অনেক জোর! তা হলে "না" বলছ কেন?'

'না, সেজন্যে না—।' আলতো করে বলল কোকো।

'তা হলে কী জন্যে?'

'দোকানদারের একশো টাকা...মার যাবে। তাই—।'

রাহুল হেসে ফেলল। কোকোকে বোঝাল যে, দোকানদার ইতিমধ্যেই অনেক টাকা লাভ করেছে। এখন একশো টাকা গেলে তার কোনও ক্ষতি হবে না।

রাহুল কোকোর হয়ে এন্ট্রি ফি জমা দিল। তারপর কোকোকে ঠেলে টিউবওয়েলটার দিকে এগিয়ে দিল।

কোকো টিউবওয়েলের হাতলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পাবলিক হইহই করে উঠল। কোকো হাতলটা ধরে সামান্য ঝুঁকে পজিশন নিল।

দোকানদার চিৎকার করে প্রতিযোগিতার ব্যাপারে নানান ঘোষণা করছিল। কোকো হাতলটা ধরে দাঁড়াতেই সে বলল, 'আপনি রেডি? এ—ক।'

কোকো টিউবওয়েল পাম্প করা শুরু করল, আর দোকানদারও গোনা শুরু করল।

কোকো যেটা করছিল সেটা হাই স্পিড সিনেমার মতো। ওর তিন নম্বর পাম্পের সঙ্গে-সঙ্গে জল বেরোতে শুরু করল। কিন্তু কোকো না থেমে পাম্প করে চলল। ছ'নম্বর পাম্পে জলের ধারাটা ময়াল সাপের মতো মোটা হয়ে গেল।

রাহুল চিৎকার করছিল, 'কোকো! থামো! থামো!' কিন্তু পাবলিকের হল্লায় ওর কথা চাপা পড়ে গেল।

দোকানদার ব্যস্তভাবে কোকোর কাছে গিয়ে ওকে থামাল। ওকে শাবাশ দিয়ে একশো টাকা পুরস্কার তুলে দিল ওর হাতে। তারপর চেঁচিয়ে বলতে লাগল কোকোর কৃতিত্বের কথা 'এইমাত্র একজন পালোয়ান জিতে নিয়েছেন এ-ক-শো টাকা। ভাইসব, আমার এই কমপিটিশানে কোনও কারচুপি নেই, কোনও চিটিংবাজি নেই। আপনারা এগিয়ে আসুন...।'

কোকো আর রাহুল ভিড় ঠেলে বাইরে এল। রাহুল কোকোর পিঠ চাপড়ে বলল, 'কনগ্র্যাচুলেশান, কোকো—শাবাশ!'

কোকো একশো টাকার নোটটা রাহুলের দিকে এগিয়ে দিল 'এটা রেখে দাও।'

রাহুল টাকাটা পকেটে রেখে বলল, 'এই টাকাটা মাম আর বাপিকে দেব। বলব, কী সহজে তুমি প্রাইজ জিতেছ—।'

ওরা দুজনে গল্প করতে-করতে 'শকুন্তলার মাঠ' ছেড়ে বেরিয়ে এল।

ফেরার পথে রেললাইনটা পেরোতেই ওরা মাকুদের দেখতে পেল। আগাছার ঝোপের পাশে একটা টালির ছাউনি দেওয়া ঘর। তার ভেতরে বসে মাকুরা তাস খেলছে। ঘরের ভেতর থেকে টিভির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'তাড়াতাড়ি পা চালাও' বলে রাহুল কোকোর হাত ধরে টানল। মাকুদের বিশ্বাস নেই। যখন-তখন ঝামেলা বাধাতে পারে।

ওরা যখন বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন কোকো হঠাৎই এক অদ্ভুত কাণ্ড করল।

রাস্তার ওপরেই সদানন্দদার চায়ের দোকান। বেড়া আর খুঁটির মাথায় টিনের চাল। দোকানের সামনে দুপাশে দুটো বেঞ্চি। তাতে জনা-চারেক খদ্দের—খবরের কাগজ পড়ছে, চা খাচ্ছে।

সদানন্দদার দোকানের পাশেই নীলুকাকুর লন্ড্রি। নীলুকাকুর চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। রোগা দুর্বল চেহারা। গায়ে ফুলশার্ট আর পাজামা। ওর দোকানটার চেহারা ওর মতোই পুরোনো। শোকেসের কাঠ কালচে হয়ে গেছে। কাচের ওপরে বাদামি ছোপ পড়েছে। দোকানের শাটার রং চটা, জং ধরা।

দোকান বন্ধ করার জন্য সেই শাটারটাই টেনে নামাতে চেষ্টা করছিল নীলুকাকু। কিন্তু পারছিল না। সেইজন্য চেঁচিয়ে সদানন্দদাকে ডাকছিল—যদি সে একটু হাত লাগিয়ে দেয়। কিন্তু সদানন্দদা চা তৈরিতে ব্যস্ত—নীলুকাকুর ডাকে সাড়া দিয়ে সে বারবার বলছিল, 'একটু সবুর করো, কাকা—যাচ্ছি।'

পথ চলতে-চলতে কোকো এসব দেখছিল, শুনছিল। হঠাৎই ও রাহুলের পাশ থেকে ছুট লাগাল নীলুকাকুর লন্ড্রির দিকে। কর্কশ গলায় বলল, 'সরে দাঁড়াও, কাকা। আমি...আমি শাটার নামিয়ে... দিচ্ছি।'

কথাগুলো বলতে যতক্ষণ লাগল তার অনেক কম সময়ে শাটারের কাছে পৌঁছে গেল কোকো। বাঁ-হাতে শাটার ধরে অনায়াসে টান মারল। প্রতিবাদের ধাতব জিগির তুলে জং ধরা শাটার অটোমেটিক এলিভেটরের মতো নেমে এল। শাটারের ঘর্ঘর শব্দে চায়ের দোকানের খদ্দেররা মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

নীলুকাকু তখন কোকোর থুতনিতে আঙুল দিয়ে ওকে আহ্লাদ করছে। বলছে, 'ও, তুই! তোকে আগে দেখতে পাইনি রে। পেলে তোকেই বলতাম। লক্ষ্মী ছেলে! তোর ভালো হোক।'

কোকো হেসে 'আসি' বলল। তারপর ছুট্রে চলে এল রাহুলের কাছে।

রাহুল বলল, 'কোকো, তোমাকে নিয়ে আর পারি না! বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ছুট লাগালে?'

'নীলুকাকুর শাটারটা...খুব শক্ত। আগেও দু-দিন আমি...ওটা টেনে নামিয়ে দিয়েছি...।'

রাহুল অবাক হয়ে কোকোর মুখের দিকে তাকাল।

বেশ কিছুদিন ধরেই কোকো একা-একা রাস্তায় বেরোয়, মামের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মুদিখানার জিনিস কিনতে যায়। বলতে গেলে মণিমেলার সব রাস্তাই ও এখন চিনে গেছে। তা ছাড়া ওকে এলাকার সবাই ভালো করে চেনে, ভালোও বাসে।

আবার রাহুলের পাশে-পাশে হাঁটতে লাগল কোকো। ওদের পাশ দিয়ে প্যাঁক-প্যাঁক হর্ন বাজিয়ে একটা সাইকেল রিকশা চলে গেল। একটা সাইকেল ভ্যান নানারকম শাকসবজি নিয়ে রাস্তার ধারের লাইটপোস্টের

নীচে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই একটা টাইমকল। তার সামনে ভিড়। জল নেওয়ার জন্য চার-পাঁচজন লোক কলসি, বালতি, জলের বোতল নিয়ে লাইন দিয়ে আছে। আকাশে মেঘের পাতলা ঝালর। তার আড়ালে অসম্পূর্ণ চাঁদ।

আজ বিকেল থেকে গুমোট ভাব ছিল। এখন হঠাৎ যেন হাওয়ার সুড়সুড়ি টের পেল রাহুল। ওর মনটা খুশি-খুশি হয়ে উঠল। ও ভাবছিল, বাড়িতে ঢুকে বাপি আর মামকে ঠিক কীভাবে কোকোর টিউবওয়েল কমপিটিশান জেতার খবরটা জানাবে।

ঠিক তখনই একটা অশ্বত্থগাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা ছায়া। কোকোর নাম ধরে ডাকল।

'অ্যাই, কোকো!'

রাহুল আর কোকো দুজনেই চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল সেদিকে।

জায়গাটা অন্ধকার। রাস্তার আলো ভালো করে পৌঁছয়নি সেখানে। গাছের কালো গুঁড়ির পাশে অস্পষ্ট একটা কালো ছায়া।

'কোকো—' আবার ডাকল সেই ছায়া।

কোকো এগিয়ে গেল অশ্বত্থ-গাছটার কাছে। পিছনে রাহুল।

ছায়াকে চিনতে পারল কোকো 'সুলতানদা! তুমি!'

'হ্যাঁ—আমি।' বলে সুলতান ওকে জড়িয়ে ধরল 'তুই কেমন আছিস?' ওকে ছেড়ে দিয়ে ওর মুখটা ভালো করে দেখতে লাগল সুলতান।

'ভালো...আছি।' কোকো বলল।

'শোন—তোর খুব বিপদ। মাস্টারজি তোকে খুঁজছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে কোকোর গলার কন্ট্রোল ব্যান্ডের লাল আর সবুজ আলো জ্বলে উঠল। এবং কোকো যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল। ব্যান্ডটা দু-হাতে আঁকড়ে ধরে ও অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। ছটফট করতে-করতে ওর শরীরটা মাটিতে পড়ে গেল। যন্ত্রণার টুকরো শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল ওর মুখ থেকে।

।। সাত ।।

সে-রাতটা রাহুলদের বলতে গেলে না ঘুমিয়েই কাটল। কারণ সুলতান যে-কাহিনি শোনাল তারপর রাহুল, ওর বাপি আর মামের দুশ্চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কোকোকে সামলে নিয়ে ধরে-ধরে বাড়ির দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল রাহুল—সঙ্গে সুলতান। যেতে-যেতে সুলতান রাহুলের সঙ্গে অল্প-অল্প কথা বলছিল।

'কোকো হারিয়ে যাওয়ার পর মাস্টারজি খেপে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তখন আমাদের পাঁচজনকে পাঁচদিকে খুঁজতে পাঠায়। সে তার রাগ কী! রেগে একেবারে আগুন। আমাকে বলে কি ''জাহান্নম থেকে হলেও ওই মেড়াটাকে খুঁজে নিয়ে আয়।'' রাগে একদম গরগর করছিল।'

'এখন কী হবে?' ভয় পেয়ে জিগ্যেস করল রাহুল।

'দেখি কী হয়।' চিন্তার সুরে বলল সুলতান। কোকোর কাঁধে আলতো চাপড় মেরে হাসল 'আসলে এই খোকাটাকে আমি বড্ড বেশি ভালোবাসি। ও খুব ভালো ছেলে। কিন্তু ওই কন্ট্রোল ব্যান্ড...।'

'কন্ট্রোল ব্যান্ড কী?'

'ওই...মাস্টারজির কন্ট্রোল।'

ওরা ততক্ষণে রাহুলদের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল।

একটু পরে ওরা সবাই বসবার ঘরে গুছিয়ে বসল। কল্যাণবাবু বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলেন। রাস্তার দিকের জানালাগুলোও ভেজিয়ে দিলেন। তারপর সুলতানের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। রাহুলের মাম স্বামীকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় ফিসফিস করে বললেন, 'আমার তো বুক কাঁপছে। রাহুল এই লোকটাকে কোথা থেকে জুটিয়ে নিয়ে এল? কী হবে এখন? তুমি বরং পুলিশে খবর দাও—।'

কল্যাণবাবু স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'এখন না। আগে এর

সঙ্গে কথা বলে দেখি। লোকটা এমনিতে খারাপ না। কোকোকে খুব ভালোবাসে—' স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে কল্যাণবাবু অনুরোধ করলেন, 'আমাদের একটু চা-টা খাওয়াবে না?'

রাহুলের মাম 'নিয়ে আসছি' বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

কল্যাণবাবু সুলতানের মুখোমুখি বসলেন। ভাবলেন, লোকটাকে দেখে তো শয়তান বলে মনে হচ্ছে না। একটু কথা বলে দেখা যাক না। কোকোকে সহজে আমরা ছাড়ব না।

সুলতানের বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। চেহারা মাঝারি। রং ময়লা। গাল বসা। থুতনিতে কাঁচাপাকা দাড়ি। কথা বলার সময় মাঝে-মাঝেই ভুরুজোড়া ওপরদিকে তোলে। গায়ে হালকা সবুজ হাফশার্ট আর ময়লা হয়ে যাওয়া জিন্‌সের প্যান্ট।

একটু পরেই মাম চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাপিকে চা দিলেন। সুলতানকে দিলেন। নিজেও নিলেন। তারপর কোকোর পাশে গিয়ে বসলেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুলতান মাস্টারজির কাহিনি বলতে শুরু করল।

'স্যার, কলকাতার কাছাকাছি খড়দায় মাস্টারজির একটা অনাথ আশ্রম আছে। ''করুণাময়ী'' নাম। সেখানে বাপ-মা মরা হ্যান্ডিক্যাপ ছেলেরা থাকে। মাস্টারজি ওদের দু-বেলা খেতে দেয়, থাকতে দেয়— আর কাজ শেখায়। কাজ তো সব নানারকমের রাজমিস্ত্রির কাজ, ছুতোরমিস্ত্রির কাজ, লেদ কারখানার কাজ, গেঞ্জির কল চালানোর কাজ, আরও কতরকম।

'মাস্টারজির অনেক কলকারখানা আছে, ব্যবসা আছে, কলকাতার সল্টলেকে তিনতলা জমকালো একটা বাড়ি আছে। লোকে বলে, মাস্টারজি বহুরকম দু-নম্বরি ব্যবসার সঙ্গে মিলেজুলে আছে। একবার জাল নোট মার্কেটে ছাড়তে গিয়ে গোয়েন্দা-পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। তিনমাস জেলও খেটেছিল। তারপর জল থেকে বেরিয়ে কীভাবে যেন পুলিশের সঙ্গে লাইন করে নিয়েছিল।'

বাপি জিগ্যেস করলেন, 'কোকো ওই ''করুণাময়ী''-তে গেল কীভাবে?'

'কীভাবে আবার! ওর নসিব।' চায়ে চুমুক দিয়ে বলল সুলতান। একটু

উসখুস করল। তারপর 'মাস্টারজির দলে অনেক আড়কাঠি আছে—দালাল। ওরা সব হ্যান্ডিক্যাপ ছেলের খবর আনে। তারপর ওই আশ্রমে ওদের ভরতি করে মাস্টারজি কমসেকম একটা বছর ঠিকঠাক চালায়। দ্যাখে যে, কেউ ওই ছেলেগুলোর খোঁজখবর করতে আসছে কি না। মানে, বাবা, মা, রিলেটিভ কেউ আসছে কি না। তারপর কেউ না এলে তখন মাস্টারজি নিশ্চিন্ত হয়। নিজের মতো করে ওদের ট্রেনিং চালু করে।'

'কীসের ট্রেনিং?' রাহুল জিগ্যেস করল।

উত্তরে মলিন হাসল সুলতান। বলল, 'ওই হরেকরকম কাজ শেখানোর ট্রেনিং। কলকারখানার কাজের ট্রেনিং। এ ছাড়া আছে ফাইটিং-এর ট্রেনিং...।'

'ফাইটিং-এর ট্রেনিং!' মাম অবাক হয়ে বললেন।

'হ্যাঁ। অনাথ আশ্রমে মাস্টারজির একটা ইল্লিগাল ক্লাব আছে। নাম "ফাইট ক্লাব"। এই ক্লাবের কথা অনেকে জানে। পুলিশও জানে। তবে ওই টাকাপয়সা দিয়ে সেখানে মাস্টারজি লাইন করে রেখেছে আর কী! তো ওই ক্লাবে সপ্তাহে দু-দিন কি তিনদিন ফাইট কমপিটিশান হয়। দুজন ফাইটার বাজি ধরে লড়াই করে। সে-লড়াই নিয়ে দর্শকরাও বাজি ধরে। লড়াইয়ের পর ফাইটারদের টাকা দেওয়া হয়। যে জেতে সে পায় বেশি। যে হারে সে পায় কম। তবে কম পেলেও সে-টাকা অনেক। এর লোভে অনেকেই লড়াইয়ে নাম দেয়।

'আশ্রমের ছেলেদের বাচ্চা বয়েস থেকেই মাস্টারজি ট্রেনিং করায়। রেগুলার ব্যায়াম শেখায়, মারপিটের হরেক টেকনিক শেখায়। একজন ট্রেনার তাই-কোন্ডো শেখায়। নাম ভগবতীপ্রসাদ। ব্ল্যাক বেল্ট। একবার শুনেছি এশিয়ার চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। কোকো ওর খুব ফেবারিট ছাত্র। আট বছর ধরে কোকোকে লড়াই শেখাচ্ছে।'

সুলতান একবার কোকোর দিকে তাকাল। কোকো শূন্য দৃষ্টি নিয়ে সরল মুখে বসে আছে। ওর চোখ সুলতানের দিকে।

সুলতান আপনমনে মাথা ঝাঁকাল। সকলের মুখের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিল। একটা বড় শ্বাস ফেলে আবার বলতে শুরু করল।

'ট্রেনিং দেওয়া ছেলেগুলোর মধ্যে থেকে মাস্টারজি "ফাইটার বয়"-

দের বেছে নেয়। তারপর ওদের খালি হাতে লড়াইয়ের স্পেশাল ট্রেনিং করায়। তারপর...তারপর ওরা ওই ‘‘ফাইট ক্লাব’’-এর জুয়ায় নাম দেয়। সেখান থেকে মেলা টাকা ইনকাম করে। ওদের সামান্য হাতখরচা দিয়ে বাকি টাকা মাস্টারজি চোট করে দেয়। তাই ‘‘ফাইটার বয়’’-দের মাস্টারজি সহজে হাতছাড়া করে না।

‘আর কোকো?’ কোকোর দিকে ইশারা করে আক্ষেপের হাসি হাসল সুলতান ‘ও এ পর্যন্ত একটাও লড়াই হারেনি। ও হচ্ছে ‘‘ফাইটার বয়’’-দের মধ্যে গোল্ডেন বয়। জুয়েল। সুপার হিরো। ওকে লড়াইয়ে নামিয়ে মাস্টারজি লক্ষ-লক্ষ টাকা ইনকাম করেছে। তাই কোনও অবস্থাতেই ওকে হারাতে চায় না মাস্টারজি। ওর খোঁজে মাস্টারজি আমাদের পাঁচজনকে লড়িয়ে দিয়েছে। আমিই সবার আগে কোকোকে খুঁজে পেলাম...কিন্তু মাস্টারজিকে সে-কথা কেমন করে জানাব! এই ছেলেটাকে আমি যে বড় ভালোবাসি...।’ কথা বলতে-বলতে কোকোর দিকে তাকাল সুলতান। ওর চোখে স্নেহ আর আদর ঝরে পড়ছিল।

হঠাৎই মোবাইল ফোন বেজে উঠল। আচমকা এই সুরেলা আওয়াজে সবাই চমকে উঠল।

সুলতান তড়িঘড়ি পকেটে হাত ঢোকাল, ফোন বের করল। ইনকামিং কলের নম্বরটা দেখার পর ও এমনভাবে ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল যেন হাতের মুঠোয় একটা ঝুমঝুমি সাপ ধরে আছে।

ওর হাবভাব দেখে কারও আরবুঝতে বাকি রইল না যে, ফোনটা কে করেছে।

বাপির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সুলতান। চোখে জিজ্ঞাসা: এখন কী করবে?

বাপি ইশারায় ওকে ফোনটা ধরতে বললেন।

‘হ্যালো—।’ ফোনটা ধরেই সুলতান লাউডস্পিকার অন করে দিল—যাতে সবাই ও-প্রান্তের কথা শুনতে পায়।

‘কে, সুলতান? মেড়াটাকে খুঁজে পেলি?’ মাস্টারজির ক্ষিপ্ত গলা।

‘না, মানে...এখনও পাইনি। খুঁজছি।’ ইতস্তত করে বলল সুলতান।

‘তুই এখন কোথায়?’

‘মণিমেলায়...।’

ও-প্রান্ত কিছুক্ষণ চুপ। তারপর 'আমরা মণিমেলা থেকে বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার মতো দূরে আছি। আমার গাড়িতে একজন লোকাল লোককে তুলে নিয়েছি—লোকটা ঘিয়া নদীর আশপাশের গ্রামগুলো সব চেনে। তুই ভালো করে বিচ্ছুটাকে খোঁজ। ওটাকে পেলে আর লড়াব না। ''করুণাময়ী''-তে এনে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেব—যাতে আর কোনও ''ফাই-টার বয়'' এরকম বেআদপি না করে।'

মাস্টারজির শাস্তির কথাটা শুনে মামের মুখ থেকে ভয়ে একটা হেঁচকির শব্দ বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে মাম মুখে হাত চাপা দিলেন—পাছে আবার কোনও শব্দ হয় এবং সেটা ফোনে শোনা যায়।

সুলতানের মোবাইল সেটটা নিশ্চয়ই বেশ দামি, কারণ মাস্টারজি যে মামের চাপা আর্তনাদটা ফোনে শুনতে পেয়েছে সেটা পরের কথাতেই বোঝা গেল।

'সুলতান, তুই এখন কোথায়? কার বাড়িতে, উঁ?' প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটু ব্যঙ্গের খোঁচা।

'না, না—কারও বাড়িতে নয়। একটা...চায়ের দোকানে...।'

'হুঁ—বুঝেছি।'

ফোন ছেড়ে দিল মাস্টারজি।

সুলতান ভয় পেয়ে গেল 'এখন কী হবে? মাস্টারজি যদি এখানে চলে আসে?'

মাম বললেন, 'শিগগির পুলিশে খবর দাও।'

'দাঁড়াও।' হাতের ইশারা করলেন বাপি 'আমাকে একটু ভাবতে দাও—।'

কোকো এবার কথা বলল 'না, আমি এ-বাড়ি ছেড়ে...কোথাও যাব না...।'

বাপি ওর দিকে একবার তাকালেন শুধু—কোনও কথা বললেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করলেন।

মাম বললেন, 'মণিমেলায় মাস্টারজি যদি আসেও আমাদের বাড়ি কেমন করে খুঁজে পাবে? কোকো এখানেই থাক। যদি কোনও বিপদ-আপদ হয় তখন বরং থানায় খবর দেওয়া যাবে।'

সুলতান মাথা চুলকোচ্ছিল। কী যেন ভাবছিল।

রাহুল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। কোকোকে দেখছিল। ও বাপিকে লক্ষ করে বলে উঠল, 'কোকোকে আমরা ছাড়ব না, বাপি। ও আমাদের কাছে থাকবে।'

বাপি পায়চারি করতে-করতে থুতনিতে কয়েকবার আঙুল বোলালেন। থানা-পুলিশ করলে ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে ওরা কী করবে কে জানে! হয়তো জেলখানাতে রেখে দেবে। নয়তো ফাইল চালাচালি করে কোনও পাগলা-গারদেই পাঠিয়ে দেবে।

বাপি আর ভাবতে পারছিলেন না।

সুলতান বলল, 'স্যার, আমি পাপী-তাপী মানুষ। মাস্টারজির পয়সা খেয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু এই ছেলেটা বড় ভালো। মানে, ওকে আমার খুব ভালো লাগে। ছোট মুখে একটা বড় কথা বলি। আপনারা ওকে কাছছাড়া করবেন না। মাস্টারজি এখানে আসে আসুক। তখন দেখা যাবে। যা হয় হবে...।'

সুলতানের কথাটা সবার মনে ধরল। মায়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল। রাহুলও ওর খুশির ভাবটা চেপে রাখতে পারছিল না।

বাপি চেয়ারে বসে পড়লেন আবার। সুলতানকে বললেন, 'আচ্ছা, ওই মাস্টারজি তো আমাদের বাড়িটা খুঁজে নাও পেতে পারে...।'

মাথা নেড়ে হাসল সুলতান 'উঁহু—সেটা হওয়ার জো নেই। ওই যে, ওর গলার ওই কন্ট্রোল ব্যান্ড। মাস্টারজির কাছে একটা রিমোট আছে। ওটার রেঞ্জ প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। ওই রিমোট দিয়ে কন্ট্রোল ব্যান্ডটাকে কন্ট্রোল করা যায়। ওই ব্যান্ডটা যদি কারও গলায় পরানো থাকে তা হলে ওই রিমোটের বোতাম টিপে বোঝা যায় লোকটা কত দূরে আছে। আর যার গলায় ওটা পরানো থাকে তাকে ওই রিমোটের বোতাম টিপে শায়েস্তা করা যায়...।'

'শায়েস্তা মানে?' বাপি জিগ্যেস করলেন।

'মানে, রিমোটের বোতাম টিপলে কোকোর বডির ভেতর দিয়ে কীসব ওয়েভ যাবে। তাতে কোকোর যন্ত্রণা হবে, ও কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করবে। আর-একটা লাল রঙের বোতাম আছে—সেটা টিপলে মাথা ধরবে, মাথার যন্ত্রণা হবে, মাথা ঘুরবে। মাস্টারজি ফরেন থেকে এরকম মেশিন বেশ কয়েকটা আনিয়েছে। "ফাইটার বয়"-দের মধ্যে যারা একটু

বেয়াড়া, এই মেশিনগুলো তাদের জন্যে। গলার ওই ব্যান্ডগুলো এমন যে, রিমোটের ঠিকঠাক বোতাম না টিপে ওগুলো গলা থেকে খুলতে গেলে অসহ্য পেইন হবে। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যাবে...।'

রাহুলের মনে পড়ল, কোকো ওর গলার ওই ব্যান্ডটায় কাউকে কখনও হাত দিতে দেয় না। মরিয়া হয়ে বাধা দেয়।

'কোকোকে নিয়ে মাস্টারজির কি প্রবলেম হচ্ছিল যে, ওর গলায় কন্ট্রোল ব্যান্ড পরিয়ে দিয়েছে?' মাম সুলতানকে জিগ্যেস করলেন।

সায় দিয়ে মাথা নাড়ল সুলতান: 'হ্যাঁ—প্রবলেম হচ্ছিল।' কোকোর দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল ও। নরম গলায় বলল, 'কোকো ''ফাইট ক্লাব''-এ আর লড়তে চাইছিল না। ও আমাকে আড়ালে বলত ওর মনের কথা। বলত, ''আমি আর লড়ব না। কাউকে আর মারব না। কষ্ট দেব না।'' এইসব কথা বলত সবসময়...।

'একদিন ও বেঁকে বসল। বলল, কিছুতেই ও আর লড়বে না। মারপিট করতে ওর আর ভালো লাগে না। মাস্টারজির সামনে রুখে দাঁড়াল। সেদিন থেকেই মাস্টারজি ছেলেটার ওপরে টরচার শুরু করল। মারধোর...সিগারেটের ছ্যাঁকা...কী না সয়েছে এই ভোলাভালা ছেলেটা...।' কথা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল সুলতান। কোকোর কাছে এগিয়ে গেল। ওর মাথায় হাত রাখল 'মাস্টারজির চামচেগিরি করে আমিও ওকে কম টরচার করেছি! কিন্তু আশ্রমে একদিন দেখি ছেলেটা আমার ঘরে ঢুকে আমার মায়ের ফটো বুকে জড়িয়ে কাঁদছে। আমার আম্মি বহুদিন আগেই মারা গেছে। কোকো সেটা জানত।

'তো আমি তাজ্জব হয়ে ওকে জিগ্যেস করলাম, ''কী রে, কী ব্যাপার? আমার মায়ের ফটো নিয়ে কাঁদছিস কেন?''

'ছেলেটা...এই হ্যান্ডিক্যাপ পাগলটা... আমাকে কী বলল জানেন, স্যার? বলল, ''সুলতানদা, আমার মা নেই। মায়ের কোনও ফটোও নেই। তাই তোমার মায়ের ফটোটা নিয়েছি...।''

'সেইদিন থেকে...সেইদিন থেকে, স্যার...আমি ওকে আমার ''ভাই'' ডেকেছি।' সুলতান চোখে কিছু একটা পড়েছে এমন ভান করে চোখ মুছল। একটু বসা গলায় বলল, 'জানেন স্যার, অনেকবার ভেবেছি মাস্টারজির দল ছেড়ে দেব। কোকোকে নিয়ে কোথাও চলে যাব—কিন্তু

পারিনি। পাপী পেট কা সওয়াল। ক'টা টাকার লোভে মাস্টারজির দলে পড়ে থেকেছি। মাস্টারজির আর-পাঁচটা পোষা গুন্ডার মধ্যে আমিও একটা হয়ে গেছি। কোকোকে সেভ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। ওর ব্যাপারে মাস্টারজি আমাকে সন্দেহ করত। তাই কোকো নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর পর মাস্টারজি আমার সঙ্গে-সঙ্গে আরও চারজনকে কোকোর খোঁজে লড়িয়ে দিয়েছে।'

মাম জিগ্যেস করলেন, 'কোকো নদীতে ঝাঁপ দিল কেমন করে?'

সুলতান ফিরে এসে ওর চেয়ারে বসল। একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, 'কয়েকজনের টিম নিয়ে মাস্টারজি বর্ধমানের একটা ফাইট কমপিটিশানে যাচ্ছিল। যারা গান-টান গায় তারা যেমন ফাংশান-টাংশান করতে যায় সেরকম মাস্টারজিও "ফাইট বয়"-দের নিয়ে মাঝে-মাঝে গ্রামে-গঞ্জে যেত। বড়-বড় টাকার বাজি হত সেখানে। কোকো যেতে চায়নি, কিন্তু ওকে জোর করে গাড়িতে তুলেছিল মাস্টারজি। গাড়িতে আমিও ছিলাম। শিবাইচণ্ডীর কাছে—একটা নদীর ব্রিজ সবে পেরিয়েছি—আমাদের গাড়ির টায়ার পাংচার হল। তো আমরা কয়েকজন গাড়ি থেকে নেমে নদীর ধারে পায়চারি করছিলাম। আগের দিন রাতে মাস্টারজি আর ওর পোষা গুন্ডাগুলো কোকোকে কয়েকঘণ্টা ধরে টরচার করেছিল। কারণ সেই একই—ও আর লড়তে চাইছিল না। এমনি-এমনি কাউকে ও আর মারতে চাইছিল না।

'তো আমরা কয়েকজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম। মাস্টারজি গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে টায়ার পালটানো দেখছিল। তখন কোকো হঠাৎ নদীতে ঝাঁপ দেয়। সেটা খেয়াল করতেই আমরা চেঁচিয়ে উঠি। মাস্টারজি ছুটে আসে নদীর পাড়ে। তারপর দৌড়ে গিয়ে গাড়ি থেকে রিমোটটা নিয়ে আসে। পাগলের মতো এ-বোতাম সে-বোতাম টিপতে থাকে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। কোকো ততক্ষণে নজরের বাইরে চলে গেছে।

'ওকে হারিয়ে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম ঠিকই। দুশ্চিন্তাও হয়েছিল। কোথায় না কোথায় গিয়ে পড়বে হ্যান্ডিক্যাপ ছেলেটা! দু-বেলা কীভাবে ওর খাবার জুটবে! আবার খুশিও হয়েছিলাম, স্যার। যে মাস্টারজির হাত থেকে খোকাটা আজাদ হতে পেরেছে...।'

সুলতান উঠে দাঁড়াল। চারপাশে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলল, 'এখানে

দেখছি কোকো খুব ভালো আছে। আপনারা ওকে ঘরের একজন করে নিয়েছেন...।' কোকোর কাছে এগিয়ে গেল সুলতান। ওর গালে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, 'কোকো, তুই এখানে থেকে যা। এখান থেকে আর কোথাও যাস না। এটা জন্নত।'

কোকো হেসে বলল, 'রাহুলকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

মাম উঠে দাঁড়ালেন। কোকোর মাথাটা মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, 'তোকে আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারব না। তুই এত ভালো। এ-গ্রামের সবাই তোকে ভালোবাসে...।'

কথায়-কথায় রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। সুলতান হাতঘড়ি দেখে বলল, 'স্যার, সব তো আপনাদের খুলে বললাম—এবারে বলুন আপনারা কী করবেন...। আমি কি চলে যাব—না আপনারা আমাকে পুলিশে দেবেন?'

মাম আর বাপি মুখচাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

সুলতান আক্ষেপের গলায় বলল, 'লাইফে অনেক পাপ করেছি। কিন্তু এই অনাথ ছেলেটার হেনস্থা আমার আর সহ্য হচ্ছে না। মাস্টারজি আমাকে পেলে হয়তো মার্ডারই করে ফেলবে। সে করুক। কিন্তু কোকোর...।'

রাহুল আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না, সুলতানদা, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। মাস্টারজি এলে আমরা মাস্টারজিকে বোঝাব...বলো না, বাপি—।' বলে বাপির দিকে তাকাল রাহুল।

বাপি বললেন, 'হ্যাঁ—রাহুল ঠিকই বলেছে। মাস্টারজিকে আমরা বোঝাব...বলব যে...,' স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকালেন 'বলব যে, কোকো আমাদের সঙ্গে থাকুক। দরকার হয় মাস্টারজিকে আমি টাকা অফার করব...।'

মাম মাথা নেড়ে বাপির কথায় সায় দিলেন। বললেন, 'মাস্টারজি আসা অবধি সুলতানভাইয়ের থাকা দরকার।' সুলতানের দিকে তাকিয়ে মাম বললেন, 'আপনি আজকের রাতটা আমাদের কাছে থেকে যান—।'

সুলতান হেসে বলল, 'থ্যাংক্স—।'

রাহুল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কোকো যন্ত্রণায় ছটফট করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। ওর গলার ব্যান্ডের লাল আর সবুজ বাতি দপদপ করে জ্বলতে শুরু করেছে।

বাপি আর মাম ওকে জাপটে ধরলেন। সামলাতে চেষ্টা করলেন। রাহুল অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

সুলতান চাপা গলায় বলল, 'মাস্টারজি মনে হয় আরও কাছে এসে গেছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে সুলতানের মোবাইল ফোন বাজতে শুরু করল।

।। আট ।।

গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন রাহুলকে জাগিয়ে দিল। তখন সবে রাতের আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। আকাশে চাপ-চাপ মেঘ থাকায় জায়গায়-জায়গায় গাঢ় ছাই রং জমাট বেঁধে ছিল। তা ছাড়া বৃষ্টির শব্দ পাচ্ছিল রাহুল। পাশের বাড়ির টিনের চালে আর গাছের পাতায় একই বৃষ্টি দুরকমের আওয়াজ তুলছিল। ব্যাপারটা অনেকটা যুগল-বন্দির মতো শোনাচ্ছিল।

কাল রাতে খাওয়া-দাওয়ার পাট সেরে রাহুলরা যখন বিছানায় শুয়েছে তখন রাত অনেক গড়িয়ে গেছে। তারপর অন্ধকার ঘরে টেনশানে জেগে ছিল তিনটি মানুষ রাহুল, সুলতান, আর কোকো। কিছুতেই ওরা দু-চোখের পাতা এক করতে পারছিল না।

পাশের ঘরে বাপি আর মামেরও একই অবস্থা। কোকোকে নিয়ে টানাপোড়েনের যন্ত্রণা ওঁদের দু-জনকেই কষ্ট দিচ্ছিল। কোকোকে হারানোর আতঙ্কে মাম ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

রাহুল এখন শুধু ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনেনি, হেডলাইটের আলোও দেখতে পেয়েছিল। কারণ, খোলা জানলার পরদা ভেদ করে আলোর ছটা ঢুকে পড়েছিল ঘরের ভেতরে। তারপর গাড়ির চলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আলোর জ্যামিতিটা দেওয়ালে ধীরে-ধীরে সরে গিয়ে রাহুলের বুককেসের ওপরে থেমেছে। এবং পরক্ষণেই নিভে গেছে।

রাহুলের বুকের ভেতরটা ধড়াস-ধড়াস করে উঠল। আবছা আলোয় ও তাকাল মেঝেতে শুয়ে থাকা সুলতান আর কোকোর দিকে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে-থেকে ওরা এখন ঘুমোচ্ছে। বোধহয় ক্লান্তিতে আর জেগে থাকতে পারেনি। শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ইঞ্জিনের শব্দটা বাড়ির কাছ ঘেঁষে এসে থামল।

রাহুল বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়াল। বেশ টের পেল ওর হাত-পা কাঁপছে।

ও সুলতানের কাছে গেল। ঝুঁকে পড়ে জোরে ঠেলা মারল ওকে 'সুলতানদা! সুলতানদা! ওঠো—ওঠো!'

সুলতান ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল। অন্ধকারে রাহুলকে ঠাহর করতে চেষ্টা করল।

'শ্-শ্-শ্-শ্' শব্দ করে সুলতানকে চুপ করে থাকতে ইশারা করল রাহুল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'জানলা দিয়ে দ্যাখো তো। একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম—।'

ঘুম কেটে গেল সুলতানের। ও চট করে উঠে দাঁড়াল। খুব সাবধানে জানলার কাছে গেল। দু-চোখে হাত ঘষে পরদা সরিয়ে উঁকি মারল।

রাহুলদের বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা কোয়ালিস গাড়ি। হালকা আলোয় গাড়ির রংটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে সাদা, কি ছাই, অথবা রুপোলি রঙের হতে পারে।

বুকটা ধক করে উঠল সুলতানের। মাস্টারজির রুপোলি রঙের একটা কোয়ালিস গাড়ি আছে!

রাহুল সুলতানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। দেখল, গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল চারজন লোক। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই ওরা ব্যস্ত-ভাবে রাহুলদের গ্রিলের গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। চার-জনের মধ্যে একজনের হাঁটার ভঙ্গিটা কেমন যেন চেনা মনে হল রাহুলের।

আর দেরি করল না রাহুল। ছুটে চলে গেল ঘরের দরজার কাছে। এক্ষুনি বাপি আর মামের ঘরে গিয়ে ডাকা দরকার।

দরজা খুলতেই বাপি আর মামকে দেখতে পেল ও। লোহার গেটের শব্দে ওঁরা জেগে উঠেছেন। জানলা দিয়ে লোকগুলোকে দেখেওছেন।

চাপা গলায় দ্রুত পরামর্শ করল সবাই। মাম বাপিকে বললেন, 'কী হবে এখন? থানায় ফোন করবে?'

বাপি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই কলিংবেল বেজে উঠল।

দু-তিন সেকেন্ড চুপ করে থেকে বাপি চোয়াল শক্ত করে বললেন, 'আর কিছু করার নেই। মোকাবিলা করতে হবে।'

কথাগুলো বলেই বাপি সুইচবোর্ডের কাছে গেলেন। আলোর সব ক'টা

সুইচ জ্বেলে দিলেন। রাহুলকে বললেন, 'বাড়ির সব আলো এক্ষুনি জ্বেলে দে। আর কোকো কোথায়?'

'ঘুমোচ্ছে।'

'ওকে শিগগির ডেকে তোল—।'

রাহুল ব্যস্তভাবে ছুট লাগাল। ওর সঙ্গে-সঙ্গে সুলতানও ছুটল।

এর মধ্যেই কলিংবেল আরও তিনবার বেজে উঠেছে। বেল বাজানোর ঢঙেই বোঝা গেল যারা এসেছে তারা বেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

এবার বন্ধ দরজায় ধাক্কা পড়ল—পরপর তিনবার।

তার একটু পরেই রাহুলের নাম ধরে কে ডেকে উঠল: 'রাহুল! রাহুল!'

রাহুল চমকে উঠল। চেনা গলা। কিন্তু কে যেন?

এর মধ্যেই ও কোকোকে ধাক্কা দিয়ে ডেকে ঘুম থেকে তুলেছে।

সব আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য বাড়িটা আলোয় আলোময়। বন্ধ দরজা থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সবাই। যেন কোনও একটা মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছিল।

আবার ধাক্কা। আবার 'রাহুল। রাহুল।'

কোকো ভয় পেয়ে রাহুলের হাত জড়িয়ে ধরল।

বাপি কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন। বললেন, 'খুলে দিই। নইলে ওরা দরজা ভেঙে ফেলবে।'

দরজা খুলতেই ওপিঠ থেকে জোরালো ধাক্কা মারল কেউ। একটা পাল্লা দেওয়ালে বাড়ি খেল। আর বাপি ছিটকে গেল একপাশে। এক-ঝলক জোলো বাতাস ছুটে এল ভেতরে।

বাপিকে তাচ্ছিল্যের ধাক্কায় সরিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল চারজন।

চারজনের শরীরই জলে ভেজা। তার মধ্যে শুধু প্রথমজনকে চিনতে পারল রাহুল। মাকু। ভিজে চুল কপালে নেমে এসেছে। মুখে-চোখে বৃষ্টির জল পড়লেও ঘুমের ছাপ এখনও মুছে যায়নি। ওর চোয়াল নড়ছে। কী যেন চিবোচ্ছে।

দ্বিতীয় লোকটা টাকমাথা। বেঁটে। দাড়ি-গোঁফ কামানো। ময়লা রোগাটে চেহারা। কুতকুতে চোখ। কালো প্যান্টের ওপরে একটা ঢোলা খয়েরি শার্ট। শার্টটা জলে ভিজে গাঢ় রঙের দেখাচ্ছে। হাতে সোনালি ব্যান্ডের একটা ঘড়ি।

লোকটার সামনের ওপরের পাটির দাঁতগুলো উঁচু। ফলে একটা খরগোশ-খরগোশ ভাব এসেছে। হঠাৎ করে দেখলে মজার কমেডিয়ান বলে মনে হয়।

কিন্তু আসলে যে তা নয় সেটা ওর হাতের গাঢ় নীল পিস্তলটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

মাকু দ্বিতীয় লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাস্টারজি—ওই যে রাহুল।' একইসঙ্গে রাহুলের দিকে চোখের ইশারা করল ও।

মাস্টারজি কাশল দুবার। বাঁ-হাত দিয়ে বৃষ্টি-ভেজা মুখ মুছল। তারপর রাহুলদের দিকে চোখ রেখেই খেঁকিয়ে উঠে হুকুম দিল, 'শিক্‌লি, দরজাটা ভালো করে এঁটে দে। যেন পাবলিক ডিসটারবেন্স না হয়...।'

হুকুমটা শোনামাত্রই সবচেয়ে পিছনে যে ছিল—শিক্‌লি—সে দরজাটা বন্ধ করে খিল আর ছিটকিনি ভালো করে এঁটে দিল।

মাস্টারজি ভেতরে ঢুকে এল। সুলতানের কাছে এসে দাঁতে দাঁত চেপে নীচু গলায় একটা গালাগাল দিল। তারপর ওর থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে চওড়া হেসে বলল, 'সালা, এটা তোর চায়ের দোকান?' পরক্ষণেই গলা মিহি করে সুলতানকে নাটুকে ঢঙে ভেংচাল 'কোকোকে এখনও পাইনি, মাস্টারজি—খুঁজছি।'

একটু থেমে শাসানির গলায় মাস্টারজি বলল, '"করুণাময়ী"-তে চল—তোর হিসেব নিচ্ছি।'

সুলতান কাঁচুমাচু মুখে হাতজোড় করে বলল, 'মাস্টারজি, মাপ করে দিন। গলতি হয়ে গেছে। প্লিজ, মাস্টারজি...।'

মাস্টারজি দাঁত বের করে হাসল, বলল, 'মাপ করে দেব—অ্যাঁ? এতবড় গুস্তাকি মাপ করে দেব?'

চোখের পলকে হাতের পিস্তলটা সাঁ করে ঘুরিয়ে সুলতানের গালে বসিয়ে দিল মাস্টারজি।

কালীপটকা ফাটার মতো শব্দ হল। সুলতানের গালে রক্তের রেখা দেখা দিল। সুলতান 'ইয়া আল্লা' বলে দু-হাতে মুখ চেপে মেঝেতে বসে পড়ল।

মাম আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন। মাকুর চোখে-মুখে ভয়ের ছায়া। আর বাপি তো পাথর!

রাহুল স্পষ্ট টের পেল কোকোর হাতটা থরথর করে কাঁপছে। ও মনে-মনে চাইছিল, মামের চিৎকারটা যেন প্রতিবেশীদের কেউ শুনতে পায়। যেন তারা সাহায্যের জন্য ছুটে আসে।

কিন্তু কাকভোরে এই বৃষ্টির মধ্যে কে আসবে!

মাস্টারজি পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিল। অস্ত্রটা ঢোলা শার্টের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল।

পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই বের করল হিংস্র লোকটা। ঘাড় কাত করে সিগারেট ধরাল। 'উঁ-উঁ' করে শব্দ করল মুখে। তারপর ধোঁয়া ছাড়ল। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইয়ের বাক্স পকেটে ভরে কয়েকবার হেঁচকি তুলে হাসল।

হঠাৎই যেন মাকুর কথা মনে পড়ে গেছে এমন ভাব করে পিছনে তাকাল মাস্টারজি। তারপর ওর কাছে এগিয়ে গেল। যেতে-যেতে পিস্তলটা আবার বের করে নিল।

সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে মাকুর পিঠ চাপড়ে দিল মাস্টারজি 'ভাগ্যিস রেললাইনের ধারে এই ছোঁড়াটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওরা বসে-বসে তাস পিটছিল...' পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট বের করল মাস্টারজি। ওটা মাকুর হাতে দিয়ে বলল, 'এই নাও, ভাই—তোমার প্রাইজ মানি। তাস খেলায় তুমি জিতছিলে—আমার সঙ্গে এসে তোমার তো লস হয়ে গেছে। তো এই নোটটা দিয়ে পুষিয়ে নিয়ো—কেমন?'

মাকু টাকাটা পকেটে ভরে কাঠ-কাঠভাবে হেসে ঘাড় কাত করল 'থ্যাংক্স—।'

শুরুতে মাস্টারজির পিস্তলটা দেখামাত্রই বাপি আর মাম ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ওঁদের ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি মাস্টারজি রাহুল কিংবা কোকোকে লক্ষ্য করে গুলি করে বসবে।

কিন্তু এতক্ষণে বোধহয় বাপি একটু সাহস জুগিয়ে উঠেছিলেন। কোনও-রকমে আমতা-আমতা করে বললেন, 'মাস্টারজি, আসুন—ঘরে এসে বসুন...।'

'হ্যাঁ, যাব...যাব।' সিগারেটে টান দিল। তারপর কোকোর দিকে তাকিয়ে 'কী, কোকো, কেমন আছিস?'

'ভালো।' রাহুলের হাতটা পেঁচিয়ে ধরে থাকা অবস্থাতেই কর্কশ

গলায় বলল কোকো। অনুভবে রাহুলের মনে হল, কোকোর কাঁপুনিটা এখনও রয়েছে।

কোকোর দিকে এগোতে শুরু করল মাস্টারজি। সুলতান তখনও মেঝেতে বসে গোঙাচ্ছিল। মাকু, শিক্‌লি, আর নাম-না-জানা একজন শাগরেদ বন্ধ দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল।

কোকোর গালে দুবার আদরের আলতো চাপড় মেরে মাস্টারজি বলল, 'কোকো, মাই ডার্লিং। অ্যাদ্দিন পালিয়ে থেকে তোর কত লস হয়ে গেল বল তো! আমারও তো বহুত টাকা লোকসান হয়ে গেল। এখন চল, ওই লস পুষিয়ে দিবি...।'

বাপি মাস্টারজির কাছে এসে অনুনয় করে বললেন, 'আপনি প্লিজ ঘরে এসে বসুন। কোকোর ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলছি...।'

কৌতুকের চোখে বাপির দিকে তাকাল 'কোকোর ব্যাপার খুলে বলবেন? আমাকে?' শব্দ করে হাসিতে ফেটে পড়ল মাস্টারজি। সিগারেটে ঘন-ঘন টান মারল। সিগারেটের আগুনটা সেই টানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল।

'না, না, আমাকে কিছু খুলে বলতে হবে না। আমি শুধু কোকোকে নিয়ে যেতে এসেছি। ও আমার।'

মাস্টারজির কথার শেষে 'ও আমার' শব্দ দুটো মাম আর বাপিকে ভীষণ ধাক্কা দিল। রাহুলকেও। একইসঙ্গে ওর হাতের ওপরে কোকোর হাতের চাপ যে বেড়ে উঠল সেটাও রাহুল টের পেল।

মাম প্রায় কান্না-কান্না গলায় মাস্টারজিকে বললেন, 'ঘরে একটু বসুন। কয়েকটা কথা আপনাকে বলতে চাই। কোকোর...।'

হাতের ইশারায় মামকে থামিয়ে দিল মাস্টারজি। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিয়ে বলল, 'বুঝেছি কী বলবেন। চলুন, ঘরে বসছি। কিন্তু আমার তাড়া আছে। বেশিক্ষণ টাইম দিতে পারব না।'

বসবার ঘরে এসে বসল মাস্টারজি। বাপি সিলিং পাখাটা অন করে মাস্টারজির মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসলেন। মাম বাপির পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাহুল আর কোকো হাত-ধরাধরি করে ঘরে ঢুকল। দরজার কাছটিতে দাঁড়িয়ে রইল।

খোলা দরজার দিকে একবার তাকাল মাস্টারজি। শিক্‌লি, মাকু, সুলতান—ওদের দেখা যাচ্ছে। সুলতান এখনও বসে আছে, তবে গালে একটা রুমাল চেপে ধরেছে।

জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা ঘরের এককোণে ছুড়ে দিল মাস্টারজি। কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, ‘জলদি বলুন—কী বলবেন।’

‘কোকো আমাদের কাছে এই তিনমাস হল... বাপি শুরু করলেন, ‘ওকে আমরা...মানে...।’

‘থাক, আর বলতে হবে না। বুঝেছি।’ জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল মাস্টারজি। একগোছা পাঁচশো টাকার নোট মুঠো করে বের করে নিয়ে এল।

টাকাগুলো দেখেই বাপির মুখ লাল হয়ে উঠল। মাম ঘেন্নায় বলে উঠলেন, ‘ছিঃ! ছিঃ!’ তারপর আর সামলাতে পারলেন না—কেঁদে ফেললেন।

বাপি এবার চোয়াল শক্ত করলেন। সুলতানের কাছ থেকে শোনা কথাগুলো এবার বোধহয় মাস্টারজিকে বলা দরকার। মাস্টারজির কাছে যতই পিস্তল থাক, ‘করুণাময়ী’-র ওই নরকে কোকো কিছুতেই ফিরে যাবে না।

‘আপনি কোকোকে নিয়ে গিয়ে কী করবেন আমরা জানি...’ এইটুকু বলার পরই সুলতানের দিকে চোখ পড়ল বাপির। সুলতান তখন বাপিকে কিছু না বলার জন্য কাতরভাবে ইশারা করছে।

মাস্টারজি মামের দিকে দেখছিল, তাই সুলতানের সূক্ষ্ম ইশারা খেয়াল করেনি। বিরক্তভাবে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে, ‘এখন এসব সেন্টিমেন্টাল নাটক দেখার টাইম নেই।’ হাতঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর কোকোর দিকে ‘অ্যাই! চল। ফালতু দেরি হচ্ছে—।’

‘না, কোকো যাবে না।’ রাহুলের মুখ দিয়ে কথাগুলো ফস করে বেরিয়ে এল।

মাস্টারজি অবাক হয়ে রাহুলের দিকে তাকাল। সাপের মতো ঠান্ডা চোখে ওকে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর ব্যঙ্গের সুরে বলল, ‘কোকো তোমার কে হয়, খোকা? বন্ধু? ওর সঙ্গে ভালোবাসা হয়েছে? লাভ স্টোরি?’ বলেই হো-হো করে হেসে উঠল মাস্টারজি।

সেই হাসি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কোকো কর্কশ গলায় বলে উঠেছে, 'আমি যাব না। রাহুলকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না—।'

কোকোর কথায় মাস্টারজি হতবাক হয়ে গেল। চোখ গোল-গোল করে কোকোর দিকে তাকিয়ে রইল—যেন ভূত দেখছে।

'জানোয়ারটা দেখি কথা বলতে শিখে গেছে!' চিবিয়ে-চিবিয়ে কথাগুলো বলল মাস্টারজি। নোটের গোছা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর পায়ে-পায়ে কোকো আর রাহুলের দিকে এগোল।

খোলা জানলা দিয়ে সকালের আলো দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি আগের চেয়ে অনেক জোরে পড়ছে। সেইসঙ্গে শুরু হয়েছে হাওয়ার ঝাপটা। কোথাও একটা খোলা জানলার পাল্লা দেওয়ালে মাথা কুটছিল। বৃষ্টির জলের রেণু বাতাসের তোড়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ছিল।

রাহুলের কাছে এসে ওর মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে এল। রাহুল সিগারেটের কড়া গন্ধ পেল। সেইসঙ্গে মদের হালকা অপবাস।

ও মুখ সরিয়ে নিতে গেল। তখন মাস্টারজি হিংস্র চাপা গলায় বলল, 'কোকো আমার। ও আমার সঙ্গে যাবে। তুই "না" বলার কে রে?'

রাহুল একটুও দমল না। জেদি বাচ্চার মতো আবার বলল, 'না, কোকো যাবে না!'

মাস্টারজি মাথা পিছিয়ে নিল। ভয়ংকর একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল রাহুলের গালে।

সাইকেলের টায়ার ফাটার মতো শব্দ হল। রাহুল কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

মাম চিৎকার করে উঠলেন। সেইসঙ্গে বাপিও।

আর কোকোর হাত বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠল। পলকে মাস্টারজির টুঁটি চেপে ধরল। মাস্টারজি জলে তলিয়ে যাওয়া মানুষের মতো দু-হাত শূন্যে ছুড়ে খাবি খেতে লাগল।

'রাহুলকে মারবে না!' কোকো পশুর মতো গর্জন করে উঠল।

'শিক্‌লি! শিক্‌লি!' মাস্টারজি চেঁচিয়ে উঠতে চাইল 'রানা! রানা! জানোয়ারটাকে ধর!'

ব্যাঙের ডাকের মতো আওয়াজ বেরোল মাস্টারজির গলা থেকে। শিক্‌লি আর তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা শাগরেদ ছুটে এল

মাস্টারজির দিকে। শিক্‌লির হাতে একটা লিকলিকে ফলার ছুরি ঝিকিয়ে উঠল।

বাপি আর মাম ততক্ষণে রাহুলকে ধরে মেঝে থেকে তুলেছেন। রাহুলের ফরসা গালে পাঁচ আঙুলের লালচে দাগ বসে গেছে।

শিক্‌লি কোকোকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছিল বুলেটের মতো। আর কোকো মাস্টারজির টুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। ও চকিতে একটা পা ভাঁজ করে শূন্যে তুলল—ঠিক একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা সারসের মতো। এবং পরমুহূর্তে সেই পা-টা ছুটে আসা শিক্‌লিকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল।

শিক্‌লির শরীরটা আবার বুলেটের গতিতেই ছিটকে গেল পিছনদিকে। দেওয়ালে গিয়ে সপাটে বাড়ি খেল। তারপর খসে পড়ল মেঝেতে। ছুরিটা ওর হাত থেকে কোথায় যেন ঠিকরে পড়ল।

রাহুল ওর স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে চিৎকার করতে শুরু করল। মাম তখন হাউহাউ করে কাঁদছেন আর কোকোর নাম ধরে ডাকছেন।

রানা নামের পাবলিক বোধহয় নিজেকে একটু বেশি বুদ্ধিমান ভেবেছিল। কারণ, ও কোকোর দিকে ছুটে আসতে-আসতে আচমকা মেঝেতে শুয়ে পড়ল। ফলে ওর দেহটা মসৃণ মেঝেতে পড়ে কোকোর পা লক্ষ্য করে দ্রুতগতিতে পিছলে এল।

সংঘর্ষটা যদি ঠিকঠাক হত তা হলে কোকো নির্ঘাত উলটে পড়ত। কিন্তু কোকোর তৎপরতায় সেটা ঠিকঠাক হল না।

ও মাস্টারজিকে এক ধাক্কা দিয়ে পিছনে ফেলে দিল। এবং বেড়ালের ক্ষিপ্রতায় শূন্যে লাফিয়ে উঠল।

যখন কোকো নীচে পড়ল তখন ওর পায়ের নীচে রানা। ঢেঁকির পাড় দেওয়ার মতো কোকোর পা রানার শরীরে বারবার আছড়ে পড়ল। তারপর ওকে চুলের মুঠি ধরে এক ঝটকায় কোকো দাঁড় করিয়ে দিল। নিজের মাথা ঠুকে দিল ওর মাথায়।

পাথরে-পাথরে ঠোকাঠুকি হল যেন। একটা 'আঁক' শব্দ করে রানা গোড়াকাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেল।

রাহুলরা অবাক হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রটা দেখছিল। মাস্টারজি, রানা আর শিক্‌লি—তিনজন তিনদিকে পড়ে আছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে



কোকোর হাত বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠল

কোকো লড়াকু সিংহের মতো ফোঁস-ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে। ওর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। এক অদ্ভুত ভালোবাসার চোখে ও রাহুলের দিকে তাকিয়ে আছে।

ওদিকে সুলতান এখনও মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ও যে কী করবে সেটা ঠিক ভেবে উঠতে পারছে না।

মাকু নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে। ভাবলেশহীন মুখ। চোয়াল নড়ছে। চুয়িংগাম বা কিছু একটা চিবোচ্ছে। রাহুল আর কোকোর সর্বনাশ দেখার জন্য ও যেন অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারে।

কোকো রাহুলের দিকে এক পা এগিয়ে এল। হাঁপাতে-হাঁপাতে জিগ্যেস করল: 'রাহুল, তোমার লাগেনি তো? তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না।'

কথা শেষ হতে না হতেই কোকো যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠল। পাগলের মতো ছটফট করতে লাগল। ওর গলার কন্ট্রোল ব্যান্ডে লাল আর সবুজ আলো দপদপ করে জ্বলতে লাগল।

রাহুল দেখল, মাস্টারজি কখন যেন উঠে বসেছে। বাঁ-হাতে একটা চেয়ার ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। সোনালি ব্যান্ডের হাতঘড়িটা ছিটকে পড়ে আছে দূরে।

কিন্তু রাহুলের নজর কাড়ল মাস্টারজির ডানহাতে ধরা জিনিসটা। একটা কালো রঙের রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট। কোকোর দিকে তাক করে মাস্টারজি বোতাম টিপে ধরেছে। আর তাতেই কোকোর শরীরে বৈদ্যুতিক মরণযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে।

কোকো ছটফট করতে-করতে মেঝেতে পড়ে গেল। ওর শরীরটা এমনভাবে ঝটকা দিয়ে বেঁকেচুরে যাচ্ছিল যেন কেউ ওকে হাই ভোল্টেজ শক দিচ্ছে। একইসঙ্গে ও যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল। মনে হচ্ছিল, ও বোধহয় এখনই মরে যাবে।

বাপি আর রাহুল কোকোর নাম ধরে বারবার ডাকছিল। মাম কোকোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করতে চাইছিলেন। আর কোকোর শরীরটা ঘন-ঘন ঝটকা মেরে ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছিল।

মাস্টারজি তখন হিংস্রভাবে হাসছে। পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসেছে

কোকোর কাছে। রিমোটটা স্থির লক্ষ্যে কোকোর দিকে তাক করা।

রিমোটটা বাঁ-হাতে নিল মাস্টারজি। তারপর ডানহাত শার্টের নীচে ঢুকিয়ে পিস্তলটা বের করে নিল। কোকোর মাথার দিকে পিস্তলের নলটা তাক করে চাপা গর্জন করে উঠল 'সালা, পাগলা কুত্তা! তোকে আর রেখে লাভ নেই। বড্ড বাড় বেড়েছিস! এবার খতম!'

মাস্টারজি হয়তো ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না।

বাইরে কোথাও বিকট শব্দে বাজ পড়ল। একইসঙ্গে মাম হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। বাপি আর রাহুল 'না! না!' বলে চেঁচিয়ে উঠল। আর আহত সুলতান ছুটে এসে মাস্টারজির পা জড়িয়ে ধরল। কুকুরের মতো কাতর 'কেঁউকেঁউ' শব্দে কোকোর প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগল।

মাকু পায়ে-পায়ে ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে এসেছিল। ও অবাক হয়ে দেখছিল, একটা সহজ-সরল প্রতিবন্ধী ছেলেকে বাঁচানোর জন্য চার-চারটে মানুষ কেমন আকুলি-বিকুলি করছে। তার মধ্যে একটা আবার মুসলমান!

অথচ এই চারজন কোকোর কেউ নয়!

মাকু এই সমীকরণটা বুঝতে পারছিল না। রক্তের সম্পর্কের বাইরের সম্পর্কটা ওকে অবাক করে দিয়েছিল। ওর মনের ভেতরে অন্যরকম একটা ঝড় উঠেছিল।

একটা টাকমাথা বেঁটে শয়তান আমাদের গ্রাম থেকে একজনকে এভাবে তুলে নিয়ে যাবে! নয়তো লাশ ফেলে দেবে বলছে! আর আমি চুড়ি পরে বসে থাকব! এটা না আমার গ্রাম! আমাদের গ্রাম!

এই কথাগুলো মনে-মনে ভাবল মাকু। একইসঙ্গে ওর মনে হল, এতক্ষণ ধরে ও ভেবেছে অনেক—এবার কিছু করা দরকার।

মাকু যে-দৌড়টা শুরু করল সেটা বোধহয় ওর বাইককে হারানোর মতন। শূন্য গতিবেগ থেকে এক অদ্ভুত ত্বরণ তৈরি করল ও। এবং যখন ওর শরীরটা মাস্টারজির শরীরে গিয়ে ধাক্কা খেল তখন মাস্টারজির মনে হল একটা প্রকাণ্ড উল্কার সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়েছে।

মাস্টারজির শরীরটা দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা বুককেসে গিয়ে ধাক্কা খেল। ঝনঝন শব্দে বুককেসের কাচ ভেঙে পড়ল। মাস্টারজির

হাতের পিস্তল আর রিমোট দু-দিকে ছিটকে পড়ল। আর মাকু হাত-পা মুড়ে কাত হয়ে পড়ে গেল চেয়ার-টেবিলের ওপরে।

মাস্টারজির জীবনীশক্তির তারিফ করতে হয়। কারণ, ভাঙা কাচের ওপরে সে স্থির হয়ে পড়ে রইল মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপরই দু-দিকে নজর চেলে দেখে নিল পিস্তল আর রিমোটটাকে। চট করে যে-কোনও একটাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নেওয়া যায়। কিন্তু কোনটা?

পিস্তলটাই বেছে নিল মাস্টারজি। এবং সেখানেই ভুল হয়ে গেল।

'ফাইটার' বয় কোকো এই কয়েক সেকেন্ড সময়ের মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। মাস্টারজি যখন পিস্তল আর রিমোটের দিকে নজর চালিয়েছে তখনই ও মেঝেতে পড়ে থাকা রানাকে মাথার ওপরে তুলে নিয়েছে। মাস্টারজির হাত পিস্তলের দিকে এগোনোমাত্রই ও রানার দেহটা মাস্টারজিকে লক্ষ্য করে স্রেফ ছুড়ে দিয়েছে।

সংঘর্ষের শব্দ হল। আর কোকো একইসঙ্গে লাফিয়ে পড়েছে মাস্টারজির ওপরে। রানার শরীরের নীচ থেকে মাস্টারজিকে টেনে বের করেছে। জামার কলার ধরে তার মুখটা তুলে এনেছে নিজের মুখের কাছে।

হাপরের মতো হাঁপাতে-হাঁপাতে কোকো বলল, 'রাহুলকে ছেড়ে আমি যাব না।' তারপর একটা ভয়ংকর হেডবাট। নিজের মাথাটা মাস্টারজির মাথায় ও সাংঘাতিক জোরে ঠুকে দিয়েছে।

'রাহুলকে ছেড়ে...আমি কোথাও যাব না।' আবার বলল কোকো।

আবার হেডবাট।

'রাহুলকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কিছুতেই না।'

আবার মাথায়-মাথায় সংঘর্ষ।

কোকো যেন সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। বারবার ও একই কথা বলছে আর ওর মাথাটা ঠুকছে মাস্টারজির টাকমাথায়। মাস্টারজির কপাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

'কোকো! কোকো, থামো!' চেঁচিয়ে উঠল রাহুল। ছুটে গেল ওর কাছে। ওকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

বাপি, মাম আর সুলতানও ওকে থামাতে চেষ্টা করল।

কোকো মাস্টারজির শরীরটা ছেড়ে দিতেই সেটা জাপানি পাখার মতো ভাঁজ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

মাকু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ওদের কাছে এসে বলল, 'আমি থানায় খবর দিচ্ছি—।'

বাপি ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি—।'

ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও থমকে গেল মাকু। মেঝেতে পড়ে থাকা শিক্‌লি, রানা আর মাস্টারজির দিকে দেখল। বলল, 'আমরা দুজনেই যাব? এখানে যদি কিছু হয়?'

হাসলেন বাপি। কোকোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'কোনও ভয় নেই। কোকো আছে।'

ওরা দরজা খুলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল।
